বাঙ্গালা সাহিত্য

জেলা বর্দ্ধমান মায়না হইতে

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

আর্য্যবন্ধু প্রেস।

সন [illegible] সাল।

উৎসর্গ পত্র।

অভিন্ন হৃদয়

শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ বিশ্বাস

মহাশয়ের

কর-কমলে

অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ

এই গ্রন্থ

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত

হইল।

অবতরণিকা।

আমি অনেক দিন হইতে বঙ্গীয় সাহিত্যালোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ইহার আলোচনে যতই অগ্রসর হইয়াছি ততই ইহার মধ্যে নানাবিধ নূতন দ্রব্য আমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছে; যতই প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়াছি ততই নূতন নূতন গ্রন্থকার দেখা দিয়াছেন; সাহিত্যালোচনের সময় আমার এক দিন মনে হইল বাঙ্গালা সাহিত্যের যথার্থ উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিলে ভাল হয়; এ সম্বন্ধে যদিও দুই একখানি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে কিন্তু তাহা এ পক্ষে যথেষ্ট নহে; এবং তত্তৎ গ্রন্থকার মহাশয়-গণও সম্মুখে যাহা পাইয়াছেন তাহাই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; ভাষার অভ্যন্তরে কেহই প্রবেশ করেন নাই; এবং কেহই ভাষার উন্নতির ক্রম প্রদর্শন করিতে যত্নবান হন নাই; জাতীয় সাহিত্যের সহিত জাতীয় বিকাশের যে সম্পর্ক আছে, ইহা তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পান নাই; আমি জাতীয় বিকাশের সহিত জাতীয় সাহিত্যের সম্বন্ধ ও সেইরূপে বাঙ্গালার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির বিষয় ইহাতে সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছি; এই নূতন প্রকার বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনে কৃতকার্য্য হইলাম কি না বলিতে পারি না। আমি যে বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব লিখি

য়াছি, তাহার প্রথম খণ্ড অদ্য পাঠক সমক্ষে উপস্থাপিত করি-লাম; উৎসাহ পাইলে অচিরে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

রায়না
১লা বৈশাখ
১২৯২।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।
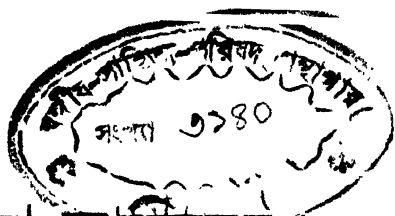
বাঙ্গালা সাহিত্য।

" If there is any thing in this world which, next after the flag of his country or its spotless honour, should be holy in the eyes of a young man, it is the language of his country. He should spend at least the third part of his life in cultivating its resources".

Thomas De Quincey.

আমরা যে এই ধন ধান্য সুশোভিত, সুন্দর লতাপাদপ সমলঙ্কৃত, পুণ্যসলিলা নদীনিচয় প্রধাবিত বঙ্গদেশে বসবাস করিতেছি, পূর্ব্বকালে ইহা উত্তাল তরঙ্গমালা পরিপ্লুত—নানাবিধ হিংস্র জলজন্তুসঙ্কুল মহাসমুদ্রের কুক্ষিগত ছিল; কত দিনে সেই ভীতিবিধায়ক মহাসমুদ্র মনুষ্যের আবাসস্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে তাহার কোন বিবরণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অধুনাতন প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ ইহার স্থান বিশেষের নিম্নদেশস্থিত মৃত্তিকা ও স্তর সন্দর্শনে প্রমান করিয়াছেন যে, কোন না কোন সময়ে এই বঙ্গদেশের উপর দিয়া মহাসাগরের ভীষণ তরঙ্গনিচয় সঞ্চালিত হইত; তখন প্রকৃতিদেবীর এই সাধের বিলাসক্ষেত্র নক্রমকরের আবাসস্থল ছিল; কিন্তু কতদিনে ছিল তাহার সুন্দর মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয় নাই,—হওয়া সম্ভবপর

নহে। তবে এইমাত্র জানিতে পারা যায়, যে যৎকালে মাননীয় আর্য্যগণ তাঁহাদের স্থতিকা গৃহ পরিত্যাগকরতঃ অভ্রংলিহ হিমালয় ও হিন্দুকুশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ধন ধান্যপূর্ণ উর্ব্বর ভারত-ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, তখন বঙ্গদেশ মহাসমুদ্রের এক অংশ মধ্যে পরিগণিত ছিল; তাঁহারা যখন ভারতের আদিম অধিবাসীদিগকে বিদূরিত করিয়া দিয়া উর্ব্বর ক্ষেত্র সকল অধিকারপূর্ব্বক ভারতে বদ্ধমূল হইয়াছিলেন, তখনও ইন্দিরালয় রত্নাকর নানা বিধ রত্ন ইহার উপরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া ছিলেন; কেননা দেখিতে পাই যৎকালে অমৃতের জন্য দেব ও দিতি স্তুতগণএকত্রে মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হন তৎকালে তাঁহারা মন্দর ভূধরকেই মন্থন দণ্ডরূপে গ্রহণ করেন; প্রমাণীকৃত হইয়াছে, মন্দরভূধর রাজমহলের কোন শৈলের শৃঙ্গ বিশেষ। ইহা হইতেই বেশ অনুমান করা যাইতে পারে যে তৎকালে মহাসমুদ্রের উত্তালতরঙ্গমালা রাজমহলেরই পাদদেশ-স্থিত বেলাভূমিতে প্রতিহত হইত; কিন্তু কতদিনে ইহা এইরূপ মনুষ্য আবাসে পরিণত হইয়াছে তাহার কোন সুন্দর প্রমাণ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক বঙ্গদেশ উৎপত্তির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি না? পরিবর্ত্তনই এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম; প্রতি দিনে—প্রতিমুহূর্ত্তে—প্রতিদণ্ডে এই পরিদৃশ্যমান বিশাল জগতের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলে ইহার অন্যথা কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না; যে বিষয়েই অনুসন্ধান করনা তাহাতেই এই বিশ্বজনীন নিয়ম প্রত্যক্ষীভূত হইবে; এমন কি বিশ বৎসর পূর্ব্বে যেস্থান সম্পূর্ণ পরিচিত ছিল, অদ্য সেই স্থান সম্পূর্ণরূপে নূতন বলিয়া বোধ হয়; দশ

বৎসর পূর্ব্বে যে শিশু দর্শন করিয়াছি—এক্ষণে সে শিশু আর তেমন নাই—দেখিলে চিনিবার কোন উপায় নাই—সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন প্রতি সপ্তবৎসরে মনুষ্যদেহ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়; সাতবৎসর পূর্ব্বে একজন যেমন ছিল আজ সে আর তেমন নাই, আবার আজ যাহা আছে আগামী সাতবৎসরে তাহার আর কিছুই থাকিবে না; মনুষ্যদেহ ক্রমিক পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এই জড়-জগৎও সেইরূপ ক্রমিক বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়া নিত্য নূতন ভাবে সমুদিত হইতেছে। অদ্য যেস্থল প্রকৃতিদেবীর রম্য-বিলাসকানন—কল্য তাহা তাঁহার বিভিন্নভাবদ্যোতক বিস্তৃত জলক্রীড়ার রঙ্গভূমি; যে বালুকাপূর্ণ—পথিকের প্রাণসংশয়কর সাহারা, এক্ষণে প্রাণীশূন্য—তৃণশূন্য হইয়া দিগন্তব্যাপী মরু-ক্ষেত্ররূপে সকলের মনে ভয়ের সঞ্চার করিতেছে, তাহা পূর্ব্বে নানাবিধ প্রাণীসঙ্কুল—উত্তাল তরঙ্গমালা পরিপ্লুত মহাসমুদ্রের অন্তর্গত ছিল;—মহীধররাজ হিমাদ্রি ও তদুপরিস্থিত ভূধরশৃঙ্গাগ্রগণ্য গৌরীশঙ্কর এক সময়ে দক্ষিণ মহাসমুদ্রের কুক্ষিগত ছিল বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এইরূপে যাহাই দেখ তাহা-তেই দেখিতে পাইবে সমুদায়ই এই পরিবর্ত্তনের অধীন। ভীম বেগশালিনী পদ্মার তীরে যাইয়া দেখ, তৎকূলস্থ যেস্থান অদ্য ধনধান্যসঙ্কুল উর্ব্বরক্ষেত্র, কল্য তাহা নদীর আয়তন বর্দ্ধিত করিতেছে;—আবার অদ্য যাহার উপর দিয়া—নাবিক নিচয় শঙ্কিতচিত্তে গমনাগমন করিতেছে, কল্য সেখানে পঞ্চমবর্ষীয় বালকও অবলীলাক্রমে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে; বঙ্গ সাগরোপকূলেও এ প্রকার পরিবর্ত্তন সদতই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই বিশ্বজনীন নিয়ম প্রভাবেই বঙ্গদেশের জন্ম;

পূর্ব্বে বলিয়াছি বৈদিক সময়ে বঙ্গভূমির অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু মন্বাদি সংহিতাকারগণের সময়ে, ইহা দেশরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু তখনও ইহা মনুষ্যের আবাস যোগ্য হয় নাই, এবং সেই জন্যই ভগবান্ মনু তীর্থ দর্শন উদ্দেশ্য ভিন্ন বঙ্গদেশে আগমন নিষেধ করিয়াছেন (১)। মহর্ষি বাল্মিকীর সময়ে ইহার কোন কোন অংশ বাসস্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; কিন্তু তখনও ইহার অধিকাংশ স্থলই জঙ্গলময় ছিল, আর্য্যগণ সেই শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া ইহার স্থানে স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন; ফলতঃ তখন বঙ্গদেশে আগমন করিলে আর প্রায়শ্চিত্য করিতে হইত না; তৎকালে ইহা পূণ্যতোয়া ভাগিরথী স্পর্শে পূত হইয়া গিয়াছে; আমরা সেই জন্যই দেখিতে পাই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সময় ইহা আর্য্যসঙ্কুল একটী সুবৃহৎ রাজ্য—সমুদ্রসেন প্রভৃতি আর্য্যবংশীয় নরপতিগণ ইহার স্বামী। দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত পাণ্ডবগণ ইহার উপর দিয়া ত্রিপুরা—হেরম্ব পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন; উর্ব্বর বঙ্গদেশের আধিপত্য পাইবার জন্য তাঁহারাও চেষ্টা করিয়াছেন; সুতরাং মহাভারতের সময়ে যে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে বাসযোগ্য ও একটী বিস্তৃত রাজ্য হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী পুরাণ প্রভৃতিতেও ইহার যথেষ্ট মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সেই পূর্ব্বকাল হইতেই বঙ্গদেশ একটী প্রবল রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু এইস্থানে একটী কথা

---

(১) তীর্থযাত্রা বিনা গচ্ছেৎ পুনঃসংস্কার মর্হতি।

মনুসংহিতা॥

বলিয়া রাখা আবশ্যক; আমরা এক্ষণে বঙ্গদেশ বলিলে যে দেশ বুঝি; পূর্ব্বকালে তাহাকে বঙ্গদেশ বলিত না। অধুনা আমরা যাহাকে বাঙ্গলাদেশ বলি, পূর্ব্বকালে তাহা বঙ্গ, গৌড়, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বল্লালসেনের রাজত্ব সময়েও ইহার সমুদায় অংশকে বঙ্গদেশ বলা হইত না; তাঁহার সময়ে ইহা রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, মিথিলা, বাগড়ী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় আখ্যাত হইত। মুসলমানগণের রাজত্ব সময়েই "বাঙ্গালা" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আইন আকবরী প্রণেতা আবুল ফজল বলেন বঙ্গদেশীয় নরপতিগণ জলপ্লাবন হইতে নিম্নপ্রদেশ সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত দশহস্ত উচ্চ ও বিংশতি হস্ত প্রশস্ত এক একটি আল বা বাঁধ দিতেন; তাহাতেই বঙ্গ ও আল এই দুই শব্দের যোগে "বঙ্গাল" বা "বাঙ্গালা" নামের উৎপত্তি হইয়াছে।) বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা সমসুদ্দীন অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন; তিনি গৌড় প্রভৃতি অন্যান্য জনপদ সকল স্বীয় করায়ত্ত করিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন; তাঁহার সময়েই (১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে) এই দেশের প্রথম বাঙ্গালাদেশ নামকরণ হয়। তদনন্তর বৎকালে বাদসাহ কুলতিলক আকবরসাহ ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিয়া ইহাকে অষ্টাদশ সুবায় বিভক্ত করেন তৎকালে তিনি সেই "বাঙ্গালা" নামই প্রবল রাখিয়াছিলেন। তদবধিই বঙ্গভূমি "বাঙ্গালাদেশ" নামে (২) অভিহিত হইয়া আসিতেছে; ও ইহার ভাষা বাঙ্গা-

---

(২) Vide preface to the "Bengali Grammar" by Babu Krishno Kishore Bannerji.

লাভাষা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে বোধ হয় স্থান ভেদে তাইাকে কেহ "গৌড়ীয় ভাষা" কেহ বা "বঙ্গীয়ভাষা" বলিত। আকবর সাহেব রাজ্যারম্ভের বহু পূর্ব্বেই "বঙ্গীয়ভাষা" জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গভাষা উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং ভাষাটি নিতান্ত সামান্য দিনের নহে। আমরা প্রমাণ করিব প্রায় সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাভাষা চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু ভাষার ইতিহাস দূরে থাকুক, ভারতের কোন ইতিহাস গ্রন্থই পাওয়া যায় না; সুতরাং অন্ধকার মধ্যে কোনরূপে প্রকৃত রাস্তা ধরিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা বাঙ্গালাভাষার ইতিহাস বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি; আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সাতশত বৎসর পূর্ব্বে যে ভাষায় স্ব স্ব মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ও তদবধি যে ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন আমরা সেই ভাষার আলোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমরা ক্রমশঃ ইহার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিব।

প্রমাণীকৃত হইয়াছে, যে অধুনাতন সুসভ্য জাতিগণ কোন সময়ে কোন এক স্থানে এক পরিবার ভুক্ত ছিলেন; তখন হিন্দু-পারসিক, গ্রীক-রোমক, জর্ম্মন-ইংরাজ প্রভৃতি কোন ভিন্ন ভেদই ছিল না; তখন সকলেই এক কর্ত্তৃত্বাধীন ও এক ভাষা ভাষী ছিলেন। আর্য্যগণের সেই সূতিকা গৃহে যখন সকলেই নিরাপদে স্বচ্ছন্দ মনে বনের ফল মূল আহরণ, পশুপালন ও কৃষি উৎপন্ন সামান্য আহারীর দ্বারা সুখে দিন যাপন করিতেন তখন তাঁহাদের মধ্যে কি ভাষা প্রচলিত ছিল তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই; তবে গ্রীক্, লাটিন, জেন্দ, সংস্কৃত প্রভৃতি সুন্দর ভাষা সকলের মধ্যে পরস্পর নানা শব্দের একতা ও

ব্যাকরণ গত অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন, যে পূর্ব্বে এই সকলেরই মূল একটি ভাষা ছিল ; পরে কাল ক্রমে সেই একই ভাষা ভাষীগণ পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিলে তাঁহাদের সেই মধুস্রাবী একই ভাষা দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল ; এবং ক্রমে এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আর সহজে তাহাদিগকে এক মূলীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইয়ুরোপীয় গণের পিতৃপুরুষগণ প্রথমেই স্বস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন ; পরে হিন্দু ও পারসীকগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ তাঁহাদের সূতিকাগৃহ পরিত্যাগ করতঃ একদল অভ্রংলিহ হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের তুষার ধবল শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া সপ্তনদী প্রধাবিত উর্ব্বর সপ্ত সিন্ধু প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, ও অপর দল ইরানে প্রবিষ্ট হইয়া জোরাস্তার ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সুখে বসবাস করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণের পিতৃ পুরুষ যৎকালে প্রথম ভারতক্ষেত্রে পদার্পন করেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের উপাসনা করিতেছেন সেই দিন হইতেই বেদ ঈশ্বর প্রদত্ত, অপৌরুষেয় ইত্যাদি শব্দে তাহার প্রাধান্য খ্যাপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। সেই দিন হইতেই বেদের গৌরব আরম্ভ হইয়াছে—ইহা সকলেরই আলোচ্য হইয়াছে।

বৈদিক সময়ে আর্য্যগণের জাতীয় জীবন সেই অল্পে অল্পে বিকাশ পাইতেছে, সামাজিক রীতি নীতি সেই প্রস্ফুটিত হইতেছে মাত্র ; তখন তাঁহাদের সমাজ সদ্যমথিত নবনীতবৎ কোমল, প্রস্তরবৎ কঠিন হয় নাই ; আর্য্যগণ তখন সরল প্রকৃতিক, উদার হৃদয়, অল্পে সন্তুষ্ট শিশুর ন্যায় ; কোন প্রকার কৃত্রিমতা তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই, বিদ্বেষ বিষ তাঁহাদের

কোমল হৃদয়কে জর্জ্জরীভূত করে নাই; সকল মনুষ্যেই সমান বিশ্বাস; তাঁহারা তখন শিশুর ন্যায় দর্পনস্থিত চন্দ্র ধরিয়াই সন্তুষ্ট। বেদ এই রূপ সরল প্রকৃতিক আর্য্যগণের হৃদয়ের মধুর উচ্ছ্বাস। বেদই সেই সময়েব জাতীয় সাহিত্য; জাতীয় সাহিত্য, জাতিয হৃদয়ের সুন্দর চিত্রপট। ইতিহাস প্রায়ই বাহিরের কথা প্রকাশ করে—জাতীয় সাহিত্য অন্তবের অন্তরতম ভাব পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া দেয়। মানব মন যখন যে ভাবে আক্রান্ত থাকে, সে দেশীয় সাহিত্যও তখন সেই সে ভাবেই সুরঞ্জিত দেখাযায়; মনুষ্য যৎকালে আহ্লাদের তরঙ্গে দিগ্‌বলয় প্রতিধ্বনিত করেন, তাৎকালিকী সাহিত্যও তখন সেই হাস্যের সঙ্গে সঙ্গে আহ্লাদে ঢল ঢল করিতে থাকে; যখন জাতীয় হৃদয় দিগ্বিজয়ের অনুপম আমোদে নৃত্য করিতে থাকে, তখন ভাষারও অভ্যন্তরে সেই আমোদের উচ্ছ্বাস, লহরী লীলা খেলিতে থাকে; আবার সেই হৃদয় যখন বিলাসের মোহন মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অলসের পদে আত্মসমর্পণ করেন, তখন জাতীয় সাহিত্যও সেই বিলাসের বিভ্রম ভঙ্গীতে অনুরঞ্জিত রহে। আবার জাতীয় হৃদয়, মর্ম্মান্তিক শোক জনিত অন্তর্দাহে দগ্ধ হইলে, জাতীয় সাহিত্যও অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অন্তরে অন্তরে উচ্ছ্বলিত হইতে থাকে। সুতরাং জাতীয় সাহিত্য সেই জাতির অন্তরের কথা যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, জাতীয় ইতিহাসে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। জাতীয় ইতিহাস প্রায়ই বাহিরের কথায় অনুপ্রাণিত—জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় হৃদয়ের গভীর মর্ম্মস্থল হইতে সমুদ্ভুত ও জাতীয় হৃদয়ের নিভৃত কক্ষস্থিত তুলিকা স্পর্শে চিত্রিত; সুতরাং জাতীয় হৃদয়ের সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তনও ইহাতে বিভা-

ষিত রহে ও জাতীয় পরিবর্ত্তনের প্রত্যেক পদচিহ্ন ইহাতে অঙ্কিত থাকে।

বৈদিক সময়ে মানব সমাজের প্রথম সৃষ্টি; মনুষ্য হৃদয় তখন প্রভাত পদ্মের ন্যায় কোমল ও নির্ম্মল—নবমল্লিকার ন্যায় সুকুমার ও পবিত্র। বেদ এইরূপ কোমল পবিত্র হৃদয়ের মধুর বিকাশ। সুতরাং বেদের সর্ব্বত্রই শিশুর সারল্য—শিশুর সৌকুমার্য্য ও শিশুর পবিত্রতা পরিলক্ষিত হয়। কপটতার নাম মাত্র ইহাতে নাই। বৈদিক ঋষিগণ প্রভাত রবির উদয়োন্মুখী প্রভাঃ সন্দর্শনেই চরিতার্থ—চন্দ্রমার নিষ্কলঙ্ক মধুর জ্যোতিতে মুগ্ধ, আবার অগ্নির রৌদ্র মূর্ত্তি ও তাহার অপরিমিত তেজ সন্দর্শনে তাহার নিকট যুক্ত হস্ত হইতেন। তাঁহারা সকল কার্য্যেই দেবানুগ্রহের প্রার্থী ছিলেন। শিশু যেমন ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই চীৎকার করিয়া থাকে, সে চীৎকারে কপটতা নাই, লুকোচুরি নাই, উচ্চাভিলাষ নাই, আহার পাইলেই সন্তুষ্ট —যাহা আবশ্যক তাহা পূরণ হইলেই প্রসন্ন চিত্ত; বৈদিক সময়ের ঋষিগণও সেইরূপ প্রয়োজন হইলেই ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদির উদ্দেশে শিশুর সরল আধ আধ স্বরে চীৎকার করিতেন—আবশ্যক পূর্ণ হইলেই হৃষ্ট চিত্ত হইতেন। বেদ সেই সরল শিশুর সরল আধ আধ মিষ্টস্বর। তাঁহারা প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে, অব্যক্ত বিহঙ্গ কলরবের ন্যায় সেই অর্দ্ধস্ফুট মধুর স্বরে, সেই অচিন্ত্য—অব্যক্ত—অবর্ণনীয় শক্তির বন্দনা করিতেন—তাহাতে কৃত্রিমতা কিছুই নাই। শিশুর অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠ-স্বরে হৃদয় সুশীতল হয়, মনে অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উদয় হয়, কিন্তু তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না,—অক্লেশে বুঝা যায় না, তত্রাপি কেমন হৃৎ প্রফুল্লকর; বেদের ভাষাও

সেই রূপ—সহজে বুঝা যায়না—তত্রাপি কেমন প্রীতিপ্রদ—কেমন মনোমুগ্ধকর, কেমন প্রফুল্লতা উন্মেষক। শুনিলেই বুঝি বা না বুঝি মন আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে।

বেদের পর সংহিতা কাল। মনুর সময়ে সমাজ আর অপূর্ণ প্রাথমিক সমাজ নহে, তখন সমাজ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, মনুষ্যগণ রাজনীতির কঠোর কূট তর্ক লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে;) তখন রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি ধর্ম্ম-নীতি লইয়া মনুষ্য হৃদয় ব্যস্ত হইয়াছে—রাজনীতিব কুটিল কৌশলের সহিত সমাজ-নীতি—ধর্ম্ম-নীতি এক সূত্রে গ্রথিত হইতেছে। রাজা তখন স্বর্গভ্রষ্ট দেবরূপী মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছেন; পণ্ডিতগণের হৃদয়ে তখন আত্মগৌরব—আত্মাভিমান প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগকে মূর্খ হইতে পৃথক করিতে সচেষ্টিত হইয়াছেন; বলবানও দুর্ব্বল হইতে পৃথক থাকিতে যত্ন করিতেছেন; ব্যবসায়ীবৃন্দ আপনাদের লাভ জনক কার্য্য আপনাপন সন্তানেই আবদ্ধ রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন! সুতরাং তখন সমাজের অবস্থা অত্যন্ত আবর্ত্তময়—তখন সমাজের উপর দিয়া বিষম তরঙ্গ মালা ছুটা ছুটি করিতেছে তখন আর মনুষ্যগণ অল্পে সন্তুষ্ট নহেন, আপনার আবশ্যক পূর্ণ হইলেই আর আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন না, এখন পরিণাম চিন্তন জাতীয় হৃদয়ে প্রবেশ পথ পাইয়াছে; সমাজের আভ্যন্তরিক ভেদ অনেকেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন; সেই সময়ের জাতীয় সাহিত্য মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ প্রণীত সংহিতা; সুতরাং ইহাতে আর বেদের শিশুর সারল্য, শিশিরসিক্ত প্রভাত পদ্মের পবিত্র শোভা দেখিতে পাওয়া যায় না; ভাষা আর শিশুর অর্দ্ধস্ফুট চিত্তরঞ্জক স্বর নহে—তখন সেই শিশুর

কথা সম্পূর্ণ রূপে ফুটিয়াছে; সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তখনও দ্রুত কথা কহিতে গেলে দুই একটি রুদ্ধ স্বর বাহির হইয়া পড়ে, তাহা আর সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। (সংহিতার ভাষায় শিশুর সৌকুমার্য্য নাই—তৎপরিবর্ত্তে উদ্ধত বালকের অনর্গল রসহীন কথা স্থান পাইয়াছে; তাহা শিক্ষিত কাকাতুয়ার চঞ্চল—গভীর—তীব্র অথচ মিষ্ট কথা আবৃত্তির ন্যায়।)

(সংহিতার পর রামায়ণ। রামায়ণের সময় লোকের প্রকৃতি ভিন্ন প্রকার—সামাজিক অবস্থা ভিন্ন প্রকার।) সংহিতার সময়ে সমাজস্থ সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য সচেষ্টিত; সুতরাং তখন সমাজকে সুশৃঙ্খলে আনিবার জন্যই সংহিতার সৃষ্টি সাধন, এবং সেই জন্যই রাজার প্রতি দেবতার আরোপ: রাজা ভূদেব: তিনি যাহা বলিবেন তাহা কাহারও অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই, কেন না তিনি সকলের মঙ্গল বিধানার্থ মনুষ্য রূপে বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। এই সময়ের বিশৃঙ্খল সমাজকে সুশৃঙ্খলে আনিবার জন্যই সংহিতায় সকল প্রকার বিধি ব্যবস্থার কথা। মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ তাৎকালিক-সমাজের আভ্যন্তরীণ ভেদ দর্শন ও পরিণামে তাহার সুখময় ফল উৎপাদন জন্যই নানাবিধ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। তাঁহাদের পরিণাম দর্শনের সেই অভীপ্সিত ফল রামায়ণ। রামায়ণের সময়ে আর সমাজের আবিলতা নাই; সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিয়াই মহাসুখী—সমাজ নির্ম্মল, স্বার্থত্যাগের বিজলী-ছটা ও প্রীতির রমণীয় ঘটা সমাজের উপর দিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে; সে সময়ে ভারতীয় সভ্যতার নবীন যৌবনের মনোহর লাবণ্যছটা সমাজের সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—প্রেমের

মধুর উচ্ছ্বাস, সকলেরই হৃদয় কন্দরকে উদ্বেলিত করিতেছে।) সে সময়ে সর্ব্বস্থানেই কুসুমিত উদ্যান—রমণীয় জ্যোৎস্নার মনোহর রজত ছটা—বাসন্তীয় মৃদু মধুর মলয় মারুতের সুমধুর নিঃস্বন প্রভৃতি যাহা কিছু সুন্দর—যাহা কিছু প্রেম-দ্যোতক—যাহা কিছু প্রীতি উন্মেষক তৎ সমুদায়ই তখন-কার সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে। ✓সেই জন্যই প্রেম—প্রীতি—দয়া—সারল্য প্রভৃতি সমুদায় সদ্গুণের আধার রামচন্দ্র সেই সময়ের অবতার—আর বিচিত্র কল্পনার খণি ভগবান্ বাল্মিকী সেই সময়ের কবি; পৃথিবীর অন্য কোন জাতীয়, কোন সাহিত্যে, বাল্মিকীর তুলনা নাই। রামচন্দ্র দয়ার উৎস—প্রীতির প্রস্রবণ—প্রেমের সাক্ষাৎ অবতার। সুখে—দুঃখে, সম্পদে—বিপদে, রাজসভায়—বৃক্ষতলায়, সুবর্ণ মণ্ডিত সিংহাসনে—ভয়ঙ্কর অবণ্যমধ্যস্থিত লতাকেতনে, নানা-বিধ মণি-মাণিক্যাদি খচিত রাজাভরণে—ও জটা বল্কল পরি-ধানে তাঁহার সমান প্রীতি—সমান তৃপ্তি—সমান শান্তি;) কিছুতেই দিনেকের জন্য তাঁহার মনে অশান্তির উদয় হয় নাই। লক্ষণের ন্যায় ভ্রাতৃ স্নেহের নিদর্শন ভারতীয় আর্য্য ভিন্ন আর কোন্ জাতিতে সম্ভবে? ভ্রাতার জন্য আত্মোৎসর্গের জীবন্ত মূর্ত্তি লক্ষণ ও স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ ভরত। রামচন্দ্র, লক্ষণ বা ভরতের চরিত্র কোন জাতিতেই পাওয়া যায় না; এবং এই জন্যই হোমার—বর্জ্জিল, সেক্ষপীর—মিল্টন প্রভৃতি কবিগুরু সকল থাকিলেও বাল্মিকীর সমকক্ষ কেহই নহেন। হোমার প্রভৃতি কবি শ্রেষ্ঠগণ অসামান্য প্রতিভা প্রদর্শন করিলেও বিভিন্ন সামাজিকতার জন্য বাল্মিকী ব্যতীত আর কেহই রামচরিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। বাল্মি-

কীর ভাষাও সেইরূপ পূত—তাহার সর্ব্বত্রই বাসন্তীয় কুসুম সৌরভ, সকল স্থানেই নবমালিকার কোমলতা, সকল স্থানেই মলয় মারুতের নিঃস্বন। যেন বৈদিক কালের সেই শিশুর অমিয় জড়িত অর্দ্ধস্ফুট মুগ্ধকর স্বর—সংহিতা কালের দশম বর্ষীয় বালকের মধুর রসহীন আলাপ—বাল্মিকীর সময়ে নবীন যৌবনের উন্মেষে সর্ব্বত্রই ধীরে ধীরে প্রীতি ও প্রেমের গান গাহিতেছে। যেমন সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর, তেমনই সুমিষ্ট ও সরলতাগ্রথিত। বাস্তবিক বাল্মিকীর সময়ে সমাজ যেরূপ উৎসাহ—প্রীতি ও পবিত্রতাময়, সে সময়ের ভাষাও সেই রূপ সরস—সরল ও সুধা পূর্ণ।

বাল্মিকীর সময় ছাড়িয়া কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সময়ে উপস্থিত হইলে সমাজ সম্পূর্ণরূপে—পার্থক্য অবলম্বন করিয়াছে দেখা যায়। তদানীন্তন সমাজ আর নবীন যৌবনে অবস্থিত নহে—তখন আর প্রেমের মোহন-মন্ত্র হৃদয়ের শান্তি নিকেতন নহে; যৌবন সুলভ অমায়িকতা—নবীন উৎসাহের পবিত্র ভাব—বসন্তের কমনীয় কান্তি—স্ফুট নলিনীর কোমলতা আর তাহাতে নাই; সমাজ তখন অতীত যৌবনে অবস্থিত; ঐ সকলের পরিবর্ত্তে তখন সমাজে স্বার্থের দুশ্চিন্তা—কপটতা—কৌশল—রাজনীতির কুটিল চক্র স্থান পাইয়াছে; তখনকার সমাজে আর এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতার জন্য আপনার স্বার্থত্যাগ করিতে চাহে না; তখন সকলেই স্ব স্ব প্রভুত্ব লাভার্থ লালায়িত। আত্মগৌরব তৎকালে সকলেরই মনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে; স্বীয়স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য তখন মনুষ্যগণ হিমালয় হইতে কুমারিকা, পঞ্চনদ হইতে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত ছুটা ছুটী করিতেছে; তখন প্রেম ও প্রীতির পরিবর্ত্তে কূট মন্ত্রণা ও

রাজনীতি স্থান পাইয়াছে; সুতরাং দয়ার উৎস রামচন্দ্রের পরিবর্ত্তে কুটিল রাজনীতি কুশল—কূট যুদ্ধপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সেই সময়ের অবতার, ও বাল্মিকীর পরিবর্ত্তে কুটিল বেদব্যাস কবি; আর যুধিষ্ঠির-দুর্য্যোধন, ভীমার্জ্জুন এ সময়ের প্রধান পুরুষ। পঞ্চপাণ্ডবে বাল্মিকীর সময়ের ন্যায় ভ্রাতৃভাব ও ভ্রাতৃপ্রেম কোথায়? এক্ষণে ভ্রাতৃভাব ও ভ্রাতৃপ্রেম রাজনীতির অধীন হইয়াছে; এখন সমাজে কেবল ছলনা—বঞ্চনা—ঈর্ষা বিরাজিত; সত্যের পরিবর্ত্তে অসত্য আসিয়া যুটিয়াছে; আধুনিক কালের লুকাচুরী অল্পে অল্পে প্রবেশ লাভ করিয়াছে;—না হইলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার হইয়াও, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ," বলিবেন কেন? তখন কোন প্রকারে কার্য্যোদ্ধার করাই তদানীন্তন সমাজের অন্তরের প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আবার উপযুক্ত সময়ের উপযুক্ত কবি বেদব্যাস। আধুনিক প্রধান রাজনীতিজ্ঞগণও যে সকল মন্ত্রণা দিতে সঙ্কুচিত হন, ব্যাস তাহা অম্লান বদনে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের সময়ে আর প্রেমের পবিত্র ভাব নাই—পরের জন্য আত্মোৎসর্গ চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, প্রীতির সুমধুর উচ্ছ্বাস আর সমাজকে প্রফুল্ল করিতে পারে না; যেন সমাজের সর্ব্বত্রই নিদাঘীয় প্রবল মার্ত্তণ্ডের তাপ। সেই জন্যই প্রৌঢ় পুরুষের স্বার্থলাভের উপায় চিন্তনের ভাষা স্বরূপ, কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের ভাষাও রসহীন—সরলতা নয় কপটতা পরিপূর্ণ। বেদব্যাসের সময় বাল্মিকীর সেই মধুর বীণা ঝঙ্কার, গভীর ভেরির রবে পরিণত হইয়াছে; সে রবে আর প্রেমিকের মন মোহিত হয় না, তাহা বিষয় বাসনা-লুব্ধ হৃদয়ের শান্তিস্থল স্বরূপ হইয়াছে। এখন ভাষা কঠিন ভাব-

বহন করিতে সমর্থ, কেবল প্রেমের কথা নহে, রাজনীতি—ধর্ম্মনীতি—সমাজনীতি—দর্শন—বিজ্ঞানের ভারবহন করিতে সমর্থ হইয়া দাঁড়াইযাছে। ইহারই কিছু পূর্ব্বে মহর্ষি কপিল তত্ত্বশাস্ত্রের বীজসূত্র লইয়া দার্শনিক চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়াছেন; সুতরাং এ সময়ের ভাষা খুব সতেজ ও তীব্র। স্বার্থ ও প্রেম এক আধারে, এক সময়ে থাকিতে পারে না; স্বার্থ আপনা লইয়াই ব্যস্ত,—যেখানে যাহা কিছু সুন্দর দর্শন করে তাহা আপনি লইবার জন্য সচেষ্টিত—স্বার্থ স্বাধীনতার মূর্ত্তি বিশেষ, সে কাহারও অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে চাহে না—পরাধীনতা, পরোপাসনা তাহার নিকট হইতে সুদূরে প্রস্থান করে, কিন্তু পরাধীনতা ও পরোপাসনাই প্রেমের প্রাণ; প্রেমের মূলে পরোপাসনা, প্রেমের পরিণামে পরের নিকট আত্মোৎসর্গ। মহাভারতে এমন স্বার্থশূন্য আত্মত্যাগের উদাহরণ একটিও দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং যে সময়ে লোকের স্বার্থ-পূর্ণ হৃদয়ে প্রেমের মোহন লহরী লীলা খেলেনা, সে সময়ের ভাষায় মধুরতার মোহন চ্ছবি কেন দেখিতে পাওয়া যাইবে? মহাভারতের সময় চতুর্দ্দিকেই যুদ্ধ বিগ্রহ, সর্ব্বত্রই স্বার্থ সিদ্ধির কুটিল মন্ত্রণা—তাই তাহার ভাষাও কুটিলতা পরিপূর্ণ—তাই কূট মন্ত্রনাময় শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতির বঙ্কিম কৌশলে সতত নিমগ্ন থাকিলেও দেব বলিয়া গণ্য। সুধু স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, তাঁহারই চক্রে পড়িয়া, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মনুষ্য প্রাণ বিসর্জন করিল—শ্রীকৃষ্ণ আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই রূপে ভূভার হরণ করিয়াছিলেন।

মহাভারতের পর শ্রীমদ্ভাগবতের কাল। মহাভারতের সময়ে সমাজ স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য বিব্রত; সেই স্বার্থ-

সিদ্ধির সম্মুখে ভয়ানক অবৈধ কার্য্য সকলও অকরণীয় বলিয়া বোধ হয় নাই;—যাহার যাহাতে ইষ্টলাভ হইবে লোকে তাহাতেই প্রমত্ত হইয়া ছিল; স্বার্থ লাভের প্রধান অন্তরায় ধর্ম্মচর্চ্চাও কাজেই তখন সুদূরে প্রস্থান করিয়াছিল—ধর্ম্মনীতির সহিত স্বার্থসিদ্ধির চিরশত্রু ভাব—সুতরাং লোকের মন হইতে তখন প্রকৃত ধর্ম্ম ভাবের সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছিল; তখন যাহার যাহা ইচ্ছা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তিনি তাহাই করিতেন। সুতরাং সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এই সময় দোলায়মান হইয়াছিল। ভারতের সময় সমাজ বীর ভাবাশ্রিত; পরপীড়ন—পরমর্দ্দন—অযথা অত্যাচার সে সময়ের বীরের ধর্ম্ম; সুতরাং ধর্ম্মনীতিও তখন বীর-ভাবাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে; পরপীড়ন—পরমর্দ্দন তখন ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তখন পশু-রক্তপৃক্ত পুষ্প ভিন্ন দেব দেবীর অর্চ্চনা করা হয় না—জাতীয় প্রথা ঈষৎ বিচলিত হইয়াছিল; যাহা হউক মহাভারতের সময়েই হিন্দুধর্ম্মের মূলগ্রন্থি কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে যুদ্ধ বিগ্রহ ক্রমে শমতা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এই বিকৃত ভাব সহজে অন্তর্হিত হইল না; সুতরাং ধর্ম্মের সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল; তাই মহাযোগী শাক্যসিংহ ভারত ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মহাভারতের বহু পূর্ব্ব-সময় হইতেই লোকের মনে দার্শনিক চিন্তা স্থান লাভ করিয়াছে; বুদ্ধদেব সেই দর্শন লইয়াই ভারতভূমে অবতীর্ণ হইলেন—সেই দর্শন লইয়াই ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহার রমণীয় ফল ফলিল; তিনি জ্ঞানাস্ত্র প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের যাবদীয় কুসংস্কার রাশি দূরীকৃত করিয়া সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিলেন; ভারতবাসী তাঁহার ধর্ম্ম

ভাবে বিভোর হইয়া গেল—সমুদায় ভারতবাসী, তাঁহার মন্ত্র-গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল; ভারতবর্ষ অনেক দিনের পর এক-বার উঠিয়া বসিল; ইহার সর্ব্বত্রই আলোকময়—সকল স্থানেই অহিংসার দিব্যমূর্ত্তি বিরাজমান। এই ধর্ম্মসংস্কার কালে নানাবিধ সুন্দরগ্রন্থ প্রণীত হইল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই বিজয় লাভ চির প্রাধান্য লাভেচ্ছু ব্রাহ্মণের উপর লৌহ শলাকা বর্ষণ করিতে লাগিল; তাঁহারা ইহার ধ্বংশ কামনা করিতেছিলেন, বিনাশ করিবার নানা কৌশল উদ্ভাবন করিতে ছিলেন, কাব্যের সহিত দর্শন মিলাইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা দেখিতেছিলেন। কিন্তু এই দুই পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মের সংঘর্ষণে সমাজে মহা হুলস্থুল ঘটিয়া উঠিল; ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ পুনরায় ঈশ্বরের নাস্তিত্বে অবিশ্বাস সূচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; লোকের মন সন্দেহ-দোলায় অবস্থিত হইল—কোন কিছুতেই হৃদয় আশ্বস্ত হইতে পারিল না; জাতীয় হৃদয় তখন স্বাধীন ভাবে নানা দিকে প্রধাবিত হইল; এমন সময় বোপদেব সমাজে জন্মগ্রহণ করি-লেন; বোপদেব দার্শনিক এবং বোপদেব কবি। শ্রীমদ্ভাগবৎ তাঁহার দার্শনিক কাব্য (৩)। দার্শনিক কবিগণ আপনা-

---

(৩) বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবৎ কার কিনা সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। তবে সাধারণ মত উহাই বলিয়া আমরা শ্রীমদ্ভাগবৎ বোপদেব প্রণীত বলিলাম। বোপদেব আধুনিক লোক, তিনি শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং ভাগবৎ কখন তাঁহার প্রণীত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবৎ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, তাঁহার জন্মের অনেক পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে।

দিগে কঙ্গেশ্বর নির্ণয়ে সমর্থ বিবেচনা করেন; শ্রীমদ্ভাগবৎকার তাহাই করিলেন। তিনি বুঝিলেন ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণ আর লোকের তৃপ্তিকর নহে—তাঁহারা আর লোকের মনে শান্তি প্রদান করিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাকে অন্য দেবতা গ্রহণ করিতে হইল এবং সেই জন্যই মহাভারতের সময় যিনি দেবরূপে কীর্ত্তিত হইয়া ছিলেন, তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণকেই আপন অভীষ্ট দেব রূপে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মহাভারতকার তাঁহাকে যে ভাবে লইয়াছিলেন তিনি তাহা লইলেন না; শ্রীমদ্ভাগবৎকার শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র-লীলা গ্রহণ না করিয়া স্বীয় কল্পনাবলে তাঁহার বাল্য ব্রজলীলা গ্রহণ করিলেন। তিনি দার্শনিক কবি; সাংখ্য পাতঞ্জলাদি শাস্ত্র সকল তাঁহার চির সহচর; সাংখ্য প্রভৃতির প্রকৃতি পুরুষ জ্ঞান তাঁহার সর্ব্বস্ব; তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে সেই প্রকৃতি পুরুষেরই অবতারণা করিলেন; পুরুষ স্থলে মহাভারত হইতে শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিয়া স্বকপোল বলে রাধিকাকে প্রকৃতি স্থানীয়া করিলেন।) প্রকৃতি পুরুষের অভেদ জ্ঞানের নাম সংসার, ও ভেদ জ্ঞানের নাম মুক্তি; দর্শনের এই কথা তিনি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিলেন। এবং এই জন্যই তিনি রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন অস্বাভাবিক বলিয়া বর্ণন ও পরিশেষে তাহাদের পরস্পর বিচ্ছেদ বা ভেদই মুক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবৎকার এই রূপ কৌশল করিয়া ভারতের ধর্ম্ম পুনরুদ্ধার করিতে সচেষ্টিত হইলেন, শেষে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল; লোক সকল তাঁহার প্রেম রসে—তাঁহার ভক্তি রসে নিমজ্জিত হইল; বৌদ্ধ যতিগণ চিরদিনের জন্য ভারত ছাড়িয়া দূরতর দেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ দার্শনিক

কাব্য; সুতরাং তাহার ভাষাও কিঞ্চিত কঠিন, সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না; এই সময় হইতেই হিন্দুধর্ম্মে কৌশল প্রবেশ লাভ করিল; ইহারই ফল পরবর্ত্তী পুরাণ সকল।

শ্রীমদ্ভাগবতের পর পৌরাণিক কাল। এ সময়ে সমাজের অবস্থা ভিন্ন প্রকার; এক্ষণে ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আবাস স্থান; পৌরাণিক সময়ে সমাজে নানাবিধ কৌশল প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তখন আর্য্যগণ নানা প্রকার সংগ্রাম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; চতুর্দ্দিকস্থ নানাবিধ বিলাস সামগ্রীর প্রলোভন আর সহজে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, এই সময়ের পূর্ব্বেই দুই এক জন জ্ঞান সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করিয়া লোকের মনে বিভিন্ন নীতির উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছেন; বৈদিক ক্রিয়াকলাপ নিতান্ত দুরূহ বলিয়া পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে; পৌরাণিক সময়ে সমাজ বৃদ্ধ; বৈদিক সময়ের শিশুও তৎসঙ্গে প্রৌঢ় দশার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। প্রৌঢ় বয়সের কার্য্য যৌবন-কৃত পাপ স্মরণে, তাহার ক্ষালন; প্রারম্ভপ্রৌঢ়ে যে সকল গর্হিত কার্য্য করিয়াছে তাহার জন্য অনুতাপের কাল বৃদ্ধাবস্থা। পৌরাণিক সময় প্রায়শ্চিত্তের সময়। প্রারম্ভপ্রৌঢ়ে বিষয়বাসনা রূপ বহ্নিতে যে সকল গর্হিত কার্য্য আহুতি প্রদান করিয়াছে তাহার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্য করিবে কি? বৈদিক সময়ের অর্দ্ধরুদ্ধ শব্দে তখন আর হৃদয় সুশীতল হয় না—তখন মৃত্যুর বিকট দশন নয়নে এক একবার দেখা যাইতেছে। বৈদিক ক্রিয়া কলাপ কঠোর বলিয়া স্বার্থান্বেষণের সময় পরিত্যক্ত হইয়াছে, সমাজ এক্ষণে কিয়দংশে আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়াছে; সুতরাং কঠিন ক্রিয়া কলাপ আর ভাল লাগিবে

কেন? তাহার পরিবর্ত্তে সহজে করণীয় ও অনায়াস বোধ্য প্রকরণের প্রয়োজন; এইরূপ সমাজের ফল পুরাণ সকল। বেদ শিক্ষা করিতে গেলে নানাবিধ শাস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক। শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দ ঋষি-স্বরাদি জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজনীয়; সুতরাং এ সময়ের অলস ও শীঘ্র ফললাভেচ্ছু সমাজে বেদের আদর ঘটিয়া উঠিল না; কারণ বেদ বিষম পরিশ্রম সাপেক্ষ ও সুন্দর ফল প্রসবী। তাই ব্যাকরণ বোধমাত্র-বোধ্য পুরাণ এই সময়ের শাস্ত্র। বেদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না হইলে যজমান-হোতা, আচার্য্য-শ্রোতা, কাহারও ফল লাভ হয় না; কিন্তু পুরাণ পাঠ সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করিলেই সমুদায় ইষ্টসিদ্ধি হয়। পৌরাণিক কালে জাতীয় হৃদয়ের সহানুভূতির ফল পুরাণ সকল। পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হয়—বক্তা স্বর্গগামী হয়—অনুষ্ঠাতা পরমসুখী হয়, সুতরাং সেই পুরাণ যাহাতে সকলেরই সহজে হৃদয়ঙ্গম ও সকলের হৃদয়াকর্ষক হয় তাহা করা প্রয়োজন; সেই জন্যই পুরাণের ভাষা—মনোহর—অনায়াস বোধ্য - সুললিত ও মার্জ্জিত। বিশেষতঃ পৌরাণিক কালের পূর্ব্বে যে দুই একজন জ্ঞান সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার গোলযোগ তুলিয়াছিলেন, এই সময়ে সেই সকল নিরাকরণ করিয়া, যাহাতে সকল লোকেই পুরাণের শীতল ছায়ায় বসিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, তাহার জন্য ঋষিগণ বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছেন। তাই পুরাণের ভাষা সাধারণতঃ পরিপাটি—সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক।

পৌরাণিক কালের পর কালিদাস প্রমুখ কবিগণের কাল। এ সময়ে সমাজ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রেমের

মোহিনী বীণা পুনরায় লোকের কর্ণে সুধা ঢালিতেছে—যেন বৃদ্ধ সমাজে নবযৌবনের মোহনস্মৃতি প্রবেশ পথ পাইয়াছে! বৃদ্ধ বয়সে প্রেমের সরস কথা যেমন সুমধুর লাগে এমন আর কিছুই নয়। কালিদাসের সময়ে সমাজের প্রথম বার্দ্ধক্য দশা; প্রথম বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্ম ও প্রেমের কথায় মন যেমন প্রীত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না; এ সময়ের সমাজ ধর্ম্ম ও প্রেমময়;) ইহাতে ধর্ম্মের সংকোচন ও প্রেমের প্রসারণ ভাব উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্যই কালিদাসীয় সমাজ কখন রমণীর বিভ্রম বিলাসভঙ্গী ও মনোহর লাবণ্যলীলায়, আবার কখন বা সমাধির নিবাত-নিষ্কম্প-স্থির গম্ভীরভাবে প্রমত্ত থাকিত। এই জন্যই মহারাজ দুষ্মন্ত তপোবনে ঋষিকন্যার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, বৃক্ষের অন্তরাল হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া অনুপম মধুরিমা অবলোকনে আত্মবিহ্বল হইলেও পরক্ষণে ধর্ম্মের সংকোচনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে দুর্গম অরণ্যজাত—কণ্টকবেষ্টিত কুসুমের ন্যায় অস্পর্শনীয় জ্ঞান করিতেছেন; সেই জন্যই দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর-পর্ব্বতের ন্যায় অচল—অটল—ধ্যাননিমীলিত নেত্র যোগীন্দ্রের নিকট কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণ গীত গাহিতে—চঞ্চল পশুগণ পাদচারনা করিতে—এমন কি পবনদেব সামান্যমাত্রস্বনন্ করিতে সাহস না পাইলেও, গিরিরাজ তনয়া অবাধে—নিঃশঙ্কিতচিত্তে, সেই নিবাত—নিস্তব্ধ—স্থিরগম্ভীর স্থানে অনায়াসে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন—পুষ্পের মালা গাঁথিয়া যোগীন্দ্রের গলায় জড়াইয়া দিতেছেন। তাই প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি মদন দগ্ধ হইয়াও জীবিত—তাই প্রেম কোপানলে পুড়িয়া ভস্ম হইলেও ধর্ম্মের জীবন্তমূর্ত্তি যোগীশ্বরের আবার শিরোভূষণ হইল। কালিদা-

সীয় সমাজে এইরূপে ধর্ম্ম ও প্রেমের বিবাদ বিসম্বাদ দেখি; আবার বিবাদে প্রথমে প্রেম নিগৃহীত হইলেও পরিশেষে তাহারই বিজয়লাভ সন্দর্শন করি। এই প্রেমভাব তখন সমাজের সকলেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে; "ব্রাহ্মণ-শূদ্র, মহৎ-ক্ষুদ্র, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ' তখন সকলেরই মনে প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে; সকলেই আপনাপন মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন শব্দে প্রকাশ করিতেছে। পণ্ডিতের ভাব প্রকাশের শব্দের সহিত, মূর্খের শব্দ মিলিতে পারে না; তাই তখন নানাপ্রকার শব্দ সমাজে স্থান পাইয়াছে—তাই তখন মাগধী-শৌরসেনী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাকৃত ভাষা জন্মলাভ করিয়াছে। কালিদাসাদির সময়েই যে প্রাকৃত ভাষা সকল উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নহে; তাঁহার সময়ের বহুকাল পূর্ব্বেই ইহাদের উৎপত্তি; তবে এই সময়েই প্রাকৃত ভাষা সকল, সংস্কৃত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে—এই সময়েই প্রাকৃত ও সংস্কৃত এক গ্রন্থনে গ্রথিত হইয়াছে। রামায়ণ বা মহাভারতের সময়ের ন্যায় সংস্কৃত এক্ষণে আর সাধারণ কথোপকথনের ভাষা নহে। নানাবিধ প্রাকৃত ভাষায় এক্ষণে প্রায় সকলেই স্ব স্ব মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে; পৌরাণিক সময়ের পূর্ব্বেই অনেক ভাষার সৃষ্টিসাধন হইয়াছে; বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ষড়-পঞ্চাশৎ প্রকার ভাষার উল্লেখ আছে (৪)। তবে আমাদের এ সময়ে প্রাকৃত ভাষার কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কালিদাসাদির সময়ে

---

(৪) ততোভাষাশ্চ সম্ভজে পঞ্চাশৎ ষট্ চ সংখ্যায়া।
তত্র জ্ঞানায়চ বালানাং তত্তদ্ব্যাকরণানিচ॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

এই সকল ভাষা পণ্ডিতগণেরও ব্যবহার্য্য হইয়াছে। সত্য বটে, কালিদাসাদি জন্মিবার বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই বুদ্ধদেব মাগধী ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন; কিন্তু বুদ্ধদেব ধর্ম্মসন্ন্যাসী—তাঁহার সময়ে প্রচলিত ভাষা গাথা—যাহাতে ইতরলোক পর্য্যন্ত তাঁহার সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে তাহাই তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ; এবং সেই জন্যই তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত হইলেও গাথা বা পালিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন; বুদ্ধদেবই কেবল পালিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু কালিদাসাদির সময়ে পণ্ডিতগণ স্বীয় গ্রন্থে যেরূপে সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপেই প্রাকৃত ভাষাও ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সময়ে প্রাকৃত নানা প্রকার ভাষা সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে; ইহা প্রচলিত হইবার কারণ নির্দ্দেশ করাও কঠিন নহে। কালিদাসীয় সমাজের বহু পূর্ব্বকাল হইতেই লোকে শনৈঃ শনৈঃ বিলাসের বশবর্ত্তী হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তখন দেবভোগ্য ভারতভূমি সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের উপভোগ্য হইয়াছে; দেবতার প্রীতি সম্বর্দ্ধক পদার্থ সকল মনুষ্যগণ অবাধে ভোগ করিতেছেন; সুতরাং মনুষ্যগণ অনেকদিন হইতে বিলাসরসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। বিলাসী হইলেই লোকে অলস হইয়া পড়েন। সুতরাং বিলাসের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে আলস্য প্রবেশ পথ পাইয়াছে; আলস্য আসিলেই পরিশ্রম দূরে প্রস্থান করে— সুতরাং পরিশ্রমলব্ধ সামগ্রী সকলও অন্তর্হিত হয়। সংস্কৃত শিক্ষা পরিশ্রম সাপেক্ষ; কাজেই অলস সমাজে সংস্কৃত শিক্ষা সুদূরে প্রস্থান করিল; কিন্তু তাহার স্থান কখন শূন্য থাকিতে পারে না; ভ্রষ্ট সংস্কৃত তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল; ক্রমে যতই সমাজ আলস্যের বশবর্ত্তী

হইতে লাগিল ততই ভ্রষ্ট সংস্কৃতের উচ্চারণও দুরূহ বোধ হইয়া আসিতে লাগিল; সুতরাং হস্তের পরিবর্ত্তে হথ, মধ্যের পরিবর্ত্তে মজঝ, প্রস্তরের পরিবর্ত্তে পথর, মিথ্যার পরিবর্ত্তে মিচ্ছা, বৃদ্ধের পরিবর্ত্তে বুড্ড ইত্যাদি শব্দ স্থান লাভ করিল। শেষে এই প্রাকৃত ভাষাই এত প্রবল হইয়া উঠিল যে তাহা রক্ষার জন্য ব্যাকরণের আবশ্যকতা হইল। তাই কাত্যায়ন—বররুচি প্রভৃতি ঋষিগণ, "প্রাকৃতপ্রকাশ" প্রভৃতি ব্যাকরণ লিখিলেন; এইরূপে প্রাকৃতের জন্মলাভ ও পুষ্টিসাধন। কালিদাসাদির সময়ে সংস্কৃত ভাষা অতি যত্নে শিক্ষণীয়া হইয়াছে; তাহা আর প্রচলিত ভাষা নহে। সেইজন্যই পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ মহারাজা বিক্রমাদিত্যও কোন সময়ে—"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি" বলিয়া অপ্রতিভ হইয়াছিলেন; সেই জন্যই কালিদাস মহাকবি ও তাঁহার ভাষা মনোমুগ্ধকর হইলেও তাহা অনায়াসবোধ্য নহে; এবং এই জন্যই কালিদাস যক্ষরূপে আপন স্ত্রীর জন্য বিনাইয়া বিনাইয়া বিরহের গীত গাহিলেও, তাহা সহজে বুঝা যায় না; যেন ভাষার ভিতর কোন অলক্ষিত কৌশল প্রবেশ করিয়াছে; সে কৌশল ঐন্দ্রজালিকের কৌশলের ন্যায়; সহজে তাহার ভিতর প্রবেশ করা যায় না অথচ তাহাতে যে কি মাধুর্য্য—কি চাতুর্য্য—কি মাদকতা আছে, দেখিলে আর তথা হইতে ফিরিতে মন সরেনা; ইচ্ছা, যেন কালিদাস সাগরে নিমজ্জিত হইয়া শরীর মন সুশীতল করি। বাস্তবিকই কালিদাসের তুলনা জগতে দুর্লভ; তাঁহার ভাষার চমৎকারিত্ব—মনোহারিত্ব—ওজস্বিতা ও নানাদিকে প্রসারণের ক্ষমতার তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে সংস্কৃত ভাষা

তখনও এক্ষণকার ন্যায় পণ্ডিতের ভাষা—যত্ন করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। কালিদাসীয় সমাজে বিলাসরস লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে—লোকে প্রেমের মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ হইয়াছে—আলস্য পরিশ্রমের স্থান অধিকার করিয়াছে—সর্ব্বত্রই কোমলতা—মধুরতা স্থান পাইয়াছে, তাই সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে এক্ষণে কোমল-মধুর প্রাকৃত সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। সেই অবধি ইহা একচ্ছত্রে রাজত্ব করিতেছে—ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থলই ইহার আয়ত্তাধীন হইয়াছে—ইহার বংশ বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছে—সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া আর কেহই ইহাকে সিংহাসন হইতে নড়াইতে পারে না;—তাহার সিংহাসন তাহার বংশেই চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কালিদাসীয় সমাজের পর জয়দেবের কাল। জয়দেবের সময়ে সমাজ স্থবির হইয়া পড়িয়াছে; সামর্থ্য নাই—তেজ নাই—উৎসাহ নাই, কেবল জড়তা পরিপূর্ণ। বীরত্বের ঘন ঘটা গর্জ্জনের পরিবর্ত্তে, মধুর প্রেমালাপ স্থান পাইয়াছে—রণক্ষেত্রের গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি, অন্তঃপুরের নূপুর নিক্কণে পরিণত হইয়াছে; ভারতীয় বীরগণ ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়াছেন; সর্ব্বত্রই অসাড়, অবশভাব বিরাজমান।) জয়দেবের সময়ে আর্য্য গৌরবের খণি ভারত মাতা জীবন্মৃতা হইয়াছেন,—নড়িবার সাধ্য নাই—কথা কহিবার সামর্থ্য নাই; যেন কঙ্কাল মাত্রে পরিণতা হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ান আছেন। ভারতীয় সমাজও সেই সঙ্গে নিস্তেজ, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রাবেশে কাতর ও ভোগনিরত হইয়া পড়িয়াছেন। তখন আর রাম—ভার্গব, ভীষ্ম—দ্রোণ, পুরু—বিক্রম নাই; ব্যাস—বাল্মিকী, মাঘ—ভারবী, কালিদাস—ভবভূতি সমাজের উপর বৈদ্যুতিকবেগ প্রসারণ করে না; কপিল—কণাদ, গৌতম

—পতঙ্গলি পৃথিবীর সুখ ছাড়িয়া অন্তঃপ্রকৃতির গুহাদপি গুহ্যস্থানে প্রবেশ করিয়া গভীর কথা প্রকাশ করে না; এ সকলই সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সমাজ এক্ষণে মুমূর্ষদশাগ্রস্থ—ধুলিশয্যায় শায়িত—নিশ্বাস মাত্র অবশিষ্ট। তাই অন্তঃপ্রকৃতির অন্তঃস্থলে প্রবেশক্ষম দার্শনিক উপেক্ষিত হইয়া বাহ্যসৌন্দর্য্য মোহিত জয়দেব সমাজের শিরোভূষণ হইয়াছেন—তাই যাঁহারা পৃথিবীতে সুখ নাই বলিয়া পারলৌকীক সুখান্বেষণের জন্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, লোকে রমণীর বিভ্রম বিলাস ভঙ্গীকেই সুখের নিদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়ের সমাজ অলস ও ইন্দ্রিয় পরতার দাস; সেই জন্যই দেখিতে পাই ইহার কিছুদিন পরেই বক্তিয়ার খিলিজী সপ্তদশমাত্র অনুচর লইয়া অবাধে বঙ্গরাজ্য স্বীয় করতলস্থ করিল; গীত-গোবিন্দ সেই ইন্দ্রিয়পর—নিশ্চেষ্ট সমাজের ফল। সেই অবধি সমাজে নূতন তান বাজিয়াছে—অন্যান্য কাব্য দূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া গীতি-কাব্যের আদর বাড়িয়াছে; তৎসমুদায়ই আলস্য—নিশ্চেষ্টতা ও গৃহ সুখ নিরতির ফল। এখন লোকে ইন্দ্রিয়পর—বিলাস বিভ্রমে বিলসিত—আত্মসুখে নিরত, সুতরাং এক্ষণকার ভাষাও যে অতি কোমল—অতি মধুর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কোমল ভাব কোমল ভাষা ভিন্ন কখনই অভিব্যক্ত হয় না ও মধুর লাগে না;) সুতরাং তখন দুরুচ্চার্য্য সংস্কৃত বা আবিলতাপূর্ণ প্রাকৃত ভাষা লোকের প্রীতিকর হইবে কেন? তাই সে সময়ে কোমলভাব প্রকাশক কোমল ভাষার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টিসাধন—বাঙ্গালাভাষার ন্যায় কোমলভাব অভিব্যক্তির ভাষা আর দ্বিতীয় নাই। এই অধ্যায়ের উপ-

পাত হইতেই ইহার সূত্রপাত—সমাজের বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত। জয়দেবের সময় বাঙ্গালাভাষা নিতান্ত শিশু বালিকা নহে, তখন ইহা আকারে পরিপুষ্টা হইয়াছে। সেই জন্যই দেখিতে পাই, গীত গোবিন্দ সংস্কৃত গ্রন্থ হইলেও, ইহার ভাষা প্রকৃত সংস্কৃত নহে—ইহার ভাষা বাঙ্গালা সংস্কৃত; ইহাতে সংস্কৃতের মাধুর্য্য ও বাঙ্গালার লালিত্য উভয়ই আছে। সংস্কৃত হইতে যত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে তৎসমুদায় অপেক্ষা বাঙ্গালার সহিত ইহার মিশামিশি অধিক; বাঙ্গালাভাষায় অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ যেমন অবাধে মিলিতে পারে, অন্য কোন সংস্কৃত মূলক ভাষায় সেরূপ হয় না; অন্য কোন প্রাকৃত ভাষার সহিত ইহা অবিকৃত ভাবে মিশ্রিত হইতে পারে না। তাই দেখি গীত-গোবিন্দের ভাষা প্রকৃত সংস্কৃত নহে তবে বাঙ্গালা মিশ্রিত সংস্কৃত বা অবিকৃত সংস্কৃত মিশ্রিত বাঙ্গালা ভাষা। গীত-গোবিন্দের অনেক স্থলের রচনার সহিত বাঙ্গালার অতি অল্পই প্রভেদ; ক্রিয়াপদগুলি পরিত্যাগ করিলে তাহা প্রকৃত বাঙ্গালাই হইয়া পড়ে। বিভক্তি ও ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য জন্যই বাঙ্গালাভাষা সংস্কৃত হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে; নচেৎ বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে কোন প্রভেদই পরিলক্ষিত হইত না। জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালার কুমারী বা প্রথমাবস্থা; সুতরাং তখন উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। কোন একটী ভাষা স্বর্ণ হওয়া সহস্র বৎসরের পরিশ্রমের ফল—এক দিনে ভাষা পূর্ণতা পাইতে পারে না;) আবার পূর্ণতা না পাইলে সে তাহার কন্যা নির্ণয় করাও সুকঠিন; সুতরাং এক্ষণে যৌবনস্থিতা বঙ্গভাষার আকারগত সৌসাদৃশ্যেই সে তাহার কন্যা নিরূপণ করা সুসাধ্য নহে। একণকার বঙ্গভাষার সহিত সংস্কৃতের

অতি অল্পই প্রভেদ। বাঙ্গালাভাষায় যত শব্দ আছে প্রায় তৎসমুদায়ই অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ; প্রাকৃত শব্দ একটিও নাই বলিলেই হয় (৫) সুতরাং আকারগত সৌসাদৃশ্যদৃষ্টে আমরা বাঙ্গালাকে সংস্কৃতেরই কন্যা বলিতে বাধ্য হইব; বাঙ্গালা সংস্কৃতের কন্যা, প্রাকৃতের নহে; তবে সংস্কৃতের যৌবন অবস্থার কন্যা নহে, বৃদ্ধ বয়সের কন্যা। বাঙ্গালা বৃদ্ধ বয়সের কন্যা বলিয়াই ইহার প্রতি সংস্কৃতের অনুগ্রহ অধিক; এই জন্যই সংস্কৃতের শেষে যাহা কিছু অলঙ্কার অবশিষ্ট ছিল ইহা তৎসমুদায়েরই অধিকারিণী। আমরা দেখাইয়াছি বৃদ্ধবয়সে মাতার কেবল কোমলতা—মাধুর্য্য ও লালিত্য মাত্র অবশিষ্ট ছিল—তাই বাঙ্গালাভাষা কোমলতাময়—মধুরিমাময় ও লালিত্য পূর্ণ এবং সেই জন্যই পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে হইলে জ্যেষ্ঠা সহোদরার মুখপানে তাকাইতে হয়; রাগ প্রকাশের শব্দ বাঙ্গালায় নাই—নীচতা অভিব্যক্তক শব্দ বাঙ্গালায় নাই। তাই রাগের কথা বলিতে গেলে হিন্দীর আশ্রয় লইতে হয়, ইতর ভাষায় "তুই—মুই" বলিতে গেলে প্রাকৃতের দিকে চাহিতে হয়। বাঙ্গালা সমুদায় প্রাকৃত ভাষার কনিষ্ঠা ভগ্নী, সেই জন্যই ইহা তাহাদেরও অতি আদরের ধন—এইরূপ সোদর স্নেহ বশতঃই তাহারা ইহাকে অবাধে কথা যোগাইয়া

---

(৫) While in Bengali, except some analogous corruption by contraction and assimilation, which every language undergoes in the mouth of a people, there are very few traces of the Prakrit dialects.& MaxMuller.

থাকে। সেই জন্যই ইহা মাতা ও সহোদরাগণের সমান প্রীতিভাজন; সকলেরই সহিত সমান আহ্লাদে মিশিতে পারে। বাঙ্গালা হিন্দী বা অন্যান্য প্রাকৃতের সহিত যে প্রকারে মিশিতে পারে, সংস্কৃতের সহিতও সেই রূপেই মিশিতে পারে, কিন্তু হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃতের সহিত সে ভাবে মিশিতে পারে না; সুতরাং অক্লেশেই বুঝাযায় সংস্কৃতের সহিত ইহার অতি নৈকট্য সম্বন্ধ। (সংস্কৃত যখন মৃলিশয্যায় —মুমর্ষদশায় পতিত, বাঙ্গালা সেই সময়েই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে ও মাতার অক্ষমতা প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠা সহোদরার অঙ্কে প্রতিপালিতা হইয়াছে, সুতরাং সহোদরার নিকট ইহা বিশেষ রূপে ঋণী। প্রাকৃত ইহার প্রতিপালিকা বলিয়া মান্য পাইতে পারে—মাতৃ সদৃশী আখ্যা পাইতে পারে—মাতৃস্থানীয়াও হইতে পারে কিন্তু মাতা হইতে পারে না। প্রাকৃত, জ্যেষ্ঠা কন্যা হইয়াও মাতার সমুদায় অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইতে পারে নাই, তাহার কারণ প্রাকৃত, সংস্কৃতের যৌবন কালের কন্যা; সুতরাং অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠা—নিজের অলঙ্কারেই অলঙ্কৃতা ও নিজের সৌন্দর্য্যেই ভূষিতা, তাহার মাতৃদত্ত অলঙ্কার লইবার প্রয়োজন হয় নাই, কাজেই পরিশেষে মাতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, বাঙ্গালাই তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়াছে; সেই জন্যই বাঙ্গালা ভাষা কোমলতা পূর্ণ—মধুরিমাময়।

বাঙ্গালা ভাষা কোমল হইবার আরও নানা কারণ আছে; আমরা দেখাইয়াছি যে সময়ের নিদ্দেষ্ট সমাজের উপযুক্ত ভাষা বাঙ্গালা এবং এক্ষণে দেখাইব বঙ্গদেশ পৃথিবীর যে স্থানে অবস্থিত তাহাতে এইরূপ কোমলতাপূর্ণ ভাষা হওয়াই স্বাভাবিক, না

হওয়া অনৈসর্গিক। দেশের প্রকৃতি অনুসারে জাতীয় জীবন গঠিত হইয়া থাকে; যে দেশের জলবায়ু যেরূপ, সে দেশের জাতীয় চরিত্রও তদনুরূপ। যে দেশে অতিকষ্টে আহারীয় অর্জ্জন করিতে হয়, সে দেশের লোক স্বাভাবিক পরিশ্রম সহিষ্ণু—সাহসী ও বিগ্রহপ্রিয় হইয়া থাকে; আর যে দেশের প্রকৃতি অতি অল্প আয়াসে প্রচুর আহারীয় প্রদান করে, সে দেশের অধিবাসীগণ সহজেই বিলাসী—ধীর প্রকৃতিক ও মৃদুস্বভাব হইয়া থাকে। দেশের জলবায়ুভেদে লোকের প্রকৃতিভেদ হয়; পণ্ডিতগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন দেশভেদে জীবজগৎ ও ঔদ্ভিদিক জগতের তারতম্য হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের কোন উদ্ভিদ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মায় না; আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যাহা জন্মে শীত প্রধান দেশে তাহা সেরূপ হয় না। সমান প্রকৃতিক স্থান হইলেই সেই সেই স্থানের ঔদ্ভিদিক সংস্থানও সমান হইয়া থাকে; এই জন্যই হিমালয় প্রদেশে সকল প্রকার বৃক্ষ লতাই পরিদৃষ্ট হয়; এখানে শীতাতপ উভয়ই আছে এইকারণ বশতঃই এদেশে নিরক্ষ স্থিত ও তুষার মণ্ডিত দেশের উদ্ভিদ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই শীতাতপ ভেদ জন্যই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের কোন পশু শীত প্রধান দেশে তিষ্ঠিতে পারেনা; তিষ্ঠিলেও ভিন্ন প্রকৃতিক হইয়া পড়ে বা সেই দেশে অবস্থানের অনুরূপ হয়। যৎকালে দেশভেদে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে এইরূপ প্রভেদ দেখা যাইতেছে তখন যে মনুষ্য জগতে তদ্রূপ কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না তাহার কারণ কি? গ্রীষ্ম প্রধান দেশজাত একজন লোক যে শীত প্রধান দেশে বাস করিলে তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না, তাহার হেতু কি? আমাদের মনে হইতেছে

আমাদের জনৈক বিলাতস্থিত বন্ধু একবার লিখিয়া ছিলেন "যে এদেশের (ইংলণ্ডের) জল বায়ু এরূপ উপাদানে গঠিত যে কোন লোক নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না ; তাহাকে কোন না কোন কার্য্য করিতেই হইবে ; রাস্তায় যাইয়া দেখ কেহই ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে না—সকলেই ছুটা ছুটী করিতেছে ; এ দেশের প্রকৃতি এরূপ যে কেহই ধীরে ধীরে বাবুয়ানা চলনে চলিয়া যাইতে পারেনা। সকলেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছে।" তাই ইংলণ্ডের এত উন্নতি ; আবার সেই ইংরাজ যখন ভারতক্ষেত্রে, বঙ্গভূমে পদার্পন করেন তখন আর একরূপ হইয়া দাঁড়ান। তখন আর তিনি পরিশ্রমী নহেন বঙ্গবাসীর ন্যায়,বিলাস ও অলসের দাস হইয়া পড়েন ; সুতরাং এরূপ হইবাব যে কিছুই কারণ নাই তাহা আমরা বলিতে পারি না ; এবং আমরা জল বায়ুকেই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। সূর্য্যের সহিত দেশের প্রকৃতির অতি নৈকট্য সম্বন্ধ ; যে দেশ সূর্য্য হইতে যতদূরে অবস্থিত সে দেশের লোক তত সাহসী ও পরিশ্রম সহিষ্ণু ; সেই জন্যই দেখিতে পাই উত্তর দেশস্থিত জাতি সকলই চিরকাল ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ ও উত্তর দেশের লোকগণই পুরাকাল হইতে দক্ষিণ স্থিত দেশ সকল আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছে ও করিতেছে। তবে অতিশয় কিছুই ভাল নহে ; সেই জন্যই অত্যন্ত গ্রীষ্ম বা অত্যন্ত শীত ভাল নহে ; এই দুয়েরই সমতা হওয়া আবশ্যক ; অত্যন্ত গ্রীষ্ম প্রদেশে বা অতিশয় শীত প্রধান দেশে লোকে সহজেই নিশ্চেষ্ট, অলস ও কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়ে।

সূর্য্য হইতে দূরস্থিত দেশ সকলের অধিবাসীগণ যেরূপ

স্বাভাবিক সাহসী ও বিগ্রহ প্রিয় ও নিকট বাসী গণ কোমল স্বভাব ও অলস, ভাষা সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপই ঘটিয়া থাকে। উত্তরস্থিত ভাষা সকল কঠিন দুরুচ্চার্য্য শ্রবণ অসুখকর ও বিরস, দক্ষিণ দেশের ভাষা সকল কোমল—শ্রবণ সুখকর—সরস ও সুমিষ্ট। বৈদিক ভাষা উত্তর দেশের ভাষা; যৎকালে আর্য্য পিতামহগণ উত্তর দেশ হইতে ভারতে আগমন করেন উহা সেই সময়ের ভাষা, সুতরাং উহা কঠিন ও বিরস। সংস্কৃত তাঁহাদের অনেকদিন দক্ষিণ দেশে বাস করিবার পর উদ্ভূত, ইহা দক্ষিণ দেশের ভাষা এইজন্য ইহা শ্রবণ তৃপ্তিকর ও সুমিষ্ট আর বাঙ্গলা ভাষা গ্রীষ্ম ও সম মণ্ডলের মধ্যস্থিত দেশের ভাষা এইজন্য ইহা আরও সরস—আরও কোমল আরও সুমিষ্ট। দেশের সংস্থান অনুসারে ভাষার এইরূপ প্রভেদ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা ফরাসী ভাষা কোমল ও সুখকর, আবার ফরাসী ভাষা হইতে ইটালির ভাষা সরস ও সুমধুর; লাটিন অপেক্ষা গ্রীক শ্রুতি সুখ উদ্বোধক। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই উত্তর দেশস্থিত ভাষা অপেক্ষা দক্ষিণ দেশীয় ভাষা সুমিষ্ট ও সুমধুর। তবে দুই একস্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়; আরবী ভাষা দক্ষিণের ভাষা হইলেও দুঃশ্রাব্য; মাক্কাউ উত্তর দেশস্থিত হইলেও তাহার ভাষা মধুর ও সুশ্রাব্য; আবার মহারাষ্ট্রীয় ভাষা দক্ষিণ দেশের ভাষা হইলেও বাঙ্গালা অপেক্ষা নিরস ও কর্কশ। কিন্তু তাহার অন্যকারণ আছে। যাহা হউক এই সকল প্রাকৃতিক ও পূর্ব্বোক্ত সামাজিক কারণ বশতঃই বাঙ্গালা ভাষা এতাধিক সরস—সরল—কোমল ও মধুর হইয়াছে। বঙ্গভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছি ইহা জয়দেবের পূর্ব্বেই সৃষ্ট

হইয়াছে; জয়দেবের সময় ইহার কুমারী অবস্থা। জয়দেব সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিলেও তিনি বাঙ্গালা ভাষারই প্রথম কবি; ভেনারেবল বিড সাহেব যেরূপ লাটিনে গ্রন্থ লিখিলেও ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম লেখক বলিয়া মান্য পাইয়াছেন; আমাদের জয়দেবও সেইরূপ।) জয়দেব বীরভূম জেলার অধিবাসী ছিলেন; বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার সময় সরল বাঙ্গালা ভাষা কথোপকথনের ভাষা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়—কেননা তাঁহারই কিছুদিন পরে সেই স্থানেই আমরা সরল বাঙ্গালায় গীতি লেখক চণ্ডীদাসের দর্শন লাভ করি,জয়দেব চণ্ডীদাস অপেক্ষা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই তিনি সংস্কৃত বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন,আর চণ্ডীদাস তত পণ্ডিত ছিলেন না, তাই তিনি সরল বাঙ্গালায় গীতি লিখিয়াছেন,কদাচিৎ ব্রজভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। (জয়দেব বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি; এক্ষণে দেখিতে হইতেছে তিনি কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; ইহার অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই তিনি মহারাজ লক্ষণ সেনের সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। লক্ষণ সেন ১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহা হইলেই জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীর লোক ও বাঙ্গালা ভাষা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।)

(জয়দেবের সময় অতিক্রম করিলে আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কালে উপস্থিত হই।) এক্ষণে দেখিতে হইতেছে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস কোন সময়ের লোক; তাহার অনুধাবনা করিলে আমরা দেখিতে পাই তাঁহারা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন; বিদ্যাপতি শিবসিংহ নামক নরপতির সভায় ছিলেন; প্রমানীকৃত হইয়াছে

শিবসিংহ মিথিলার অন্যতম অধিপতি। বিদ্যাপতি স্বীয় রচিত বহুল পদাবলীতে এই শিবসিংহ ও তৎপত্নী লছিমা দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন বিদ্যাপতি মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু এ কথায় আমরা আস্থা সম্পন্ন হইতে পারি না; বিদ্যাপতি ব্রজ ও মৈথিল ভাষাতে বহুল পদাবলী রচনা করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় ইঁহারা তাঁহাকে মৈথিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন. কিন্তু সামান্য মাত্র অনুধাবনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি মৈথিল ছিলেন না এবং মিথিলা তাঁহার পূর্ব্ববাসস্থান ছিল না। বঙ্গদেশ তাঁহার বাসস্থান ছিল। এস্থলে এ কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে তিনি যদি বঙ্গদেশীয়ই ছিলেন তাহা হইলে তাঁহার অধিকাংশ গীতি ব্রজ বা মৈথিল ভাষায় হইবার তাৎপর্য্য কি? ইহার কারণ নির্ণয় করা দুরূহ নহে; বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার থাকা অসম্ভব; তাঁহার সময়ে মুসলমানগণ এ দেশের অধিপতি, মুসলমান রাজত্ব কালে পারসীক ভাষাই লাভকরী ও রাজভাষা ছিল; এ দেশীয় সাধারণ লোকে লাভকরী বিদ্যারই অনুশীলনা করিতেন এবং ব্রাহ্মণগণ আপনাদের প্রাধান্য অব্যাহত রাখিবার জন্য যথা-পূর্ব্ব সংস্কৃত শাস্ত্রেরই আলোচনা করিতেন। বাঙ্গালা ভাষার সেই বাল্যাবস্থা—সেই অল্পে অল্পে বিকশিত হইতেছে সেই উহা সামান্য মৃদু প্রবাহী বিলের ন্যায়, জঙ্গালপূর্ণ ভূমির উপর দিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে মাত্র; তখন ইহাতে মধু-রতা ছিল না—গম্ভীরতা ছিল না; সুতরাং তখন তাহা কোন বিদেশীয় পণ্ডিতের আলোচ্য ভাষা হয় নাই। বিদ্যাপতির পূর্ব্বে কোন প্রকৃত বাঙ্গালা লেখক ছিলেন না; সুতরাং তিনি

দূরস্থিত বিদেশীয়, অজ্ঞাত ভাষা শিক্ষা করিবেন কি প্রকারে? আবার তখন আজি কালিকার ন্যায় এক মুহূর্ত্তে বর্দ্ধমান হইতে মিথিলা যাওয়া যাইত না, কাজেই সে দেশের সহিত এদেশের কোন বিশেষ সংস্রব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তদানীন্তন সাধারণ মৈথিলগণের বঙ্গদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান এক্ষণকার মৈথিলগণ অপেক্ষা কম ছিল বলিয়াই বোধ হয়। ইতর লোকে বাঙ্গালাদেশের নামও জ্ঞাত ছিল কি না সন্দেহ এবং ভদ্রলোকে ইহার নাম পরিজ্ঞাত থাকিলেও ইহার কোন খোজ খবর রাখিতেন কি না বলা যায় না। সুতরাং যে দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান এত অল্প—সেই অজ্ঞাত দেশের—অজ্ঞাত ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য মৈথিল বিদ্যাপতি কেন এত আয়াস স্বীকার করিবেন? আবার তাঁহার সময় বাঙ্গালাভাষা সেই বিকশিত হইতেছে মাত্র—লোকে বাঙ্গালায় স্ব স্ব মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে মাত্র,—তখন ভাষা শিক্ষা করিবার কোন প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই। বাঙ্গালা শিক্ষা করিবার এতাদৃশ বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বিদ্যাপতি কিরূপে এই বিদেশীয়—বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিবেন; আবার শুধু শিক্ষা নহে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম কবি বলিয়া মান্য পাইবেন? যে ভাষায় পূর্ব্বে কোন গ্রন্থই থাকে নাই—কোন রচনাই থাকে নাই এমন একটী বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাকে নূতন অলঙ্কার দেওয়া কি সহজ ব্যাপার, এবং এরূপ দৃষ্টান্ত কি অন্য কোন জাতীয় সাহিত্যে আছে? যাহা হউক আমরা কোন মতেই বিদ্যাপতিকে মৈথিল বলিতে সম্মত নহি। তবে তিনি মিথিলার রাজা শিবসিংহের আশ্রয়ে অনেক দিন ছিলেন ইহা সত্য। পূর্ব্বকালে বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ মিথিলায় শাস্ত্রাধ্যয়ন

করিতে যাইতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে না; তবে পক্ষধর মিশ্রের পর সময় হইতে যখন পণ্ডিত কেশরী রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইয়া আপন প্রভা বিকীর্ণ করেন সেই সময় হইতে দুই একজন মৈথিল পণ্ডিতও বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন এরূপ জানা যায; কিন্তু কবি বিদ্যাপতির সময়ে মৈথিলগণ এদেশে প্রায়ই আসিতেন না; তখন বঙ্গদেশ বিদ্যাচর্চ্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সুতরাং বিদ্যাপতির সে সময়ে মিথিলা হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে অপরিচিত বিদ্যাশিক্ষা করা অসম্ভব; বরং বঙ্গবাসী হইয়া মিথিলায় যাওয়াই সম্ভব; এবং বিদ্যাপতি তাহাই করিয়াছিলেন; তিনি বঙ্গবাসী ছিলেন এবং বিদ্যা শিক্ষার্থী হইয়া মিথিলায় গমন করেন। সেখানে অনেক দিন অবস্থানের জন্য মৈথিল ভাষাতেও জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু বাঙ্গালা তাঁহার মাতৃভাষা; সুতরাং তাঁহার সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও মৈথিল এই তিন ভাষাতেই অধিকার লাভ করা সম্ভব। এবং তাই তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও মৈথিল এই তিন ভাষাতেই কবিতাদি লিখিয়াছেন। মিথিলায় তিনি অনেক দিন বাস করেন—মিথিলাতেই তাঁহার উচ্চ শিক্ষা লাভ—এবং মৈথিল রাজই তাঁহায় আশ্রয় দাতা; সুতরাং মৈথিল ভাষাতেও তাঁহার অনেক গীতি রচিত না হইবে কেন? আবার বাঙ্গালা তাঁহার চিরাভ্যস্ত ভাষা—বাঙ্গালাতেই তিনি প্রথম কথা কহিতে শিখিয়াছেন—বাঙ্গালাই তাঁহার কৌমার ও যৌবন কালের ভাষা সুতরাং বাঙ্গালাতে রচিত পদও নিতান্ত অল্প সংখ্যক নহে। বিদ্যাপতির কোন কোন গীতি বিশুদ্ধ মৈথিল, কিন্তু তিনি সেই গুলি বঙ্গবাসীর সুগম করিবার জন্য সেই সেই

গীতি বাঙ্গালাতেও রচনা করিয়াছেন, এতদ্দৃষ্টে কি বঙ্গবাসীর সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি জানা যাইতেছে না। এই স্থানে যদি কেহ বলেন যে বিদ্যাপতির সময়ে বঙ্গভাষা সম্পূর্ণ রূপে সৃষ্ট হয় নাই, সেই পৃথক হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র তাহাতে আমরা বলি যদি বঙ্গভাষা সে সময়ে সৃষ্ট না হইয়া থাকে তাহা হইলে বিদ্যাপতির সম সাময়িক কবি চণ্ডীদাস কি প্রকারে প্রায় তাঁহার যাবতীয় কবিতাই বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় রচনা করিতে সমর্থ হইলেন? বাঙ্গালাভাষা তখন সম্পূর্ণরূপে সৃষ্ট হইয়াছে তবে বিদ্যাপতি উপরোক্ত নানা কারণ বশতঃ নানাবিধ ভাষায় লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই ব্রজভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কারণ আছে ইহারা উভয়েই শ্রীমদ্ভাগবৎ বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ব্রজলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, ব্রজলীলা বর্ণন ব্রজভাষায় বড় মধুর লাগে, তাই তাঁহারা বাঙ্গালার সহিত ব্রজভাষা মিশ্রিত করিয়াছেন।

আমরা দেখাইলাম বিদ্যাপতি বঙ্গবাসী ছিলেন, মিথিলা তাঁহার জন্মস্থান ছিল না, তবে তিনি মিথিলায় বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। যে সময়ে বাঙ্গালা প্রাকৃত হইতে পৃথক হইতেছে সেই সময়ে বিদ্যাপতির জন্ম, সুতরাং তিনি হিন্দীমিশ্রিত বাঙ্গালায় কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহা একদেশদর্শী লোকের উক্তি বলিয়া বোধ হয়, কেন না যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষাতে লিখিলেও কতক গুলি গীতি বিশুদ্ধ বাঙ্গালাতেও লিখিয়াছেন এবং চণ্ডীদাস তাঁহার সম-সাময়িক কবি হইয়াও কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় গীতি

রচনা করিয়াছেন, তখন বাঙ্গালা ভাষা সেই উৎপন্ন হইতেছে কি প্রকারে বলিব? তবে একথা প্রামাণিক যে সপ্তম শতাব্দীতে যৎকালে চীন দেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ্গ এদেশে আগমন করেন তখন বাঙ্গালা বলিয়া কোন ভাষা ছিল না; তিনি বলিয়াছেন মগধ হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত প্রায় একই ভাষা প্রচলিত, কিন্তু আমরা বলি তিনি বিদেশীয় লোক, মগধ ও বাঙ্গালা দেশে এক ভাষা প্রচলিত থাকিলেও যে তখন তাহার মধ্যে স্থানভেদে কোন অবান্তর ভেদ হয় নাই, তাহা তিনি কি প্রকারে জানিবেন? আরও তিনি বলিয়াছেন, আসাম ও উৎকলের ভাষা বাঙ্গালার ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এক্ষণেও সেই ভিন্নতাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ও মৈথিল প্রায় এক রকমের ভাষা, বাঙ্গালা ও মৈথিল অক্ষরে অতি অল্পই প্রভেদ, সুতরাং তাহারা যে একজন বিদেশীয় লোকের কর্ণে ও চক্ষুতে সমান বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা বলিয়াছি জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালাসাহিত্যের কুমারী কাল, আমরা এক্ষণে হুয়েন্থসাঙ্গের কথা হইতে প্রমাণ করিব যে বাঙ্গালা ভাষা সপ্তম শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমরা উপরে বলিয়াছি, মিথিলা ও বাঙ্গালার ভাষা ও অক্ষরে অতি অল্পই প্রভেদ, তাহা একজন বিদেশীয় ভ্রমণকারীর পক্ষে সমান বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া অসম্ভব নহে। আবার তিনি যখন বাঙ্গালার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রান্তস্থিত আসাম ও উৎকলের ভাষা বিভিন্ন বলিয়াছেন, তখন মিথিলা হইতে বাঙ্গালার ভাষা যে সামান্যতঃ পৃথক হইয়াছিল তাহাই তাঁহার বলা হইল, কেন না কোন দেশের সীমাভেদে তাহার ভাষার সম্পূর্ণ প্রভেদ ঘটিতে পারে;

না; ইহার ক্রম আবশ্যক। একটি শুঁয়াপোকা কখন একেবারে প্রজাপতি হয় না; কার্পাস একেবারে বস্ত্ররূপে পরিণত হয় না; সকল পরিবর্ত্তনেরই ক্রম আবশ্যক; ক্রমিক অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন হইয়া শেষে এমন হইয়া দাঁড়ায় যে তাহা মূল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে কোন নূতন পদার্থ বলিয়া জ্ঞান জন্মে। কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কৌষিক বস্ত্র, রেসম ও গুটি এই তিনটী পদার্থ দর্শন করিলে তাহাদিগকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই অনুমান করিবেন; একটি গুটি ও কৌষিক বস্ত্র সহজ দৃষ্টিতে বিভিন্ন পদার্থ বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু যিনি সমুদায় দেখিয়াছেন তিনি বলিবেন পদার্থ এক কিন্তু ক্রম বিভিন্ন। হুয়েন্থসাঙ্গের দৃষ্টিও এইরূপ; যখন তিনি মগধে ছিলেন, তথায় এক প্রকার ভাষা দেখিয়াছেন; বাঙ্গালায় তাহার অনুরূপ দেখিলেন কিন্তু উৎকলের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। সপ্তম শতাব্দীতে মগধ হইতে উৎকল বা আসাম যাওয়া কিরূপ কষ্টসাধ্য ছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিদেশীয় হুয়েন্থসাঙ্গ যে এই অপরিচিত দেশের অপরিচিত রাস্তার উপর দিয়া পদব্রজে গমন করিয়া ছিলেন তাহা অসম্ভব, তাঁহাকে নিশ্চয়ই নৌকাযান আশ্রয় করিতে হইয়াছিল; তাহা হইলে ভাষার ক্রম জ্ঞাত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; তিনি যদি পদব্রজে যাইতেন তাহা হইলে দেশ ভেদে ভাষা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে বুঝিতে পারিতেন, এবং দেখিতেন মগধ হইতে যত দূরবর্ত্তী হইতেছেন ভাষা ততই বিভিন্ন হইতেছে; বঙ্গদেশ, মগধ ও উৎকল বা আসামের মধ্যস্থিত দেশ। যখন হুয়েন্থসাঙ্গ মগধ ও উৎকলের ভাষা পরস্পর ভিন্ন বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ক্রম অনুসারে বাঙ্গালা

দেশের ভাষা মাগধী বা মৈথিলী ভাষা হইতে সাধারণতঃ পৃথক হইয়াছিল; সেই পৃথকত্বেই বাঙ্গালা ভাষার জন্ম; এই স্থানে যদি কেহ বলেন হুয়েন্তসাঙ্গ মগধ হইতে তাম্রলিপ্তি দিয়া উৎকলে গমন করেন; কিন্তু তিনি তাম্রলিপ্তি ও মগধের ভাষা প্রায়ই এক প্রকার বলিয়াছেন; তিনি পূর্ব্বে মগধে অনেক দিন অবস্থিতি করেন ও তাম্রলিপ্তিতেও সমুদ্রগামী পোতের জন্য তাঁহাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল; সুতরাং এই উভয় স্থানের ভাষা বিশেষ করিয়া দেখিবার তাঁহার অবসর হইয়াছিল, এই দুই স্থানের ভাষায় কিঞ্চিৎ ভিন্নতা থাকিলে তাহা তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া তিনি উভয়স্থানের ভাষা প্রায় এক প্রকার বলিলেন অথচ উৎকলের ভাষা সম্পূর্ণরূপে পৃথক বলিয়াছেন, তাহার কারণ কি? এতদুত্তরে আমরা বলি তিনি মগধে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া যে, সে দেশের ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে; এবং তিনি মগধ হইতে নৌকাযোগে তাম্রলিপ্তিতে আসিলেও মধ্যে মধ্যে মধ্যদেশবাসীগণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই; এমন কি বোধ হয় তাঁহাকে প্রতিদিনই নৌকাত্যাগ করিয়া কূলে উঠিতে হইত; তাহা হইলে কূলবর্ত্তী লোকগণের সহিত তাঁহার প্রায় প্রতিদিনই পরিচয় হইত; মাগধীভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন থাকিলে এই সকল লোকের কথার সহিত তাহার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি মাগধী বা মৈথিলী ভাষার সহিত বাঙ্গালার অতি অল্পই প্রভেদ; সুতরাং তাহা বিদেশীয় লোকের সহজ জ্ঞাতব্য নহে। যদি কোন এক সুচিত্রকর একটি নিষ্কলঙ্ক সুন্দরীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া

তাহারই পার্শ্বে পার্শ্বে ক্রমাগত ঈষৎ নিকৃষ্ট করিয়া এক একটি সুন্দরীর চিত্র অঙ্কিত করেন, এবং এইরূপ করিতে করিতে যদি সর্ব্বশেষে চিত্রিতা রমণীটী অতিশয় কুৎসিতা হয়; তাহা হইলেও সেই অনুপম সুন্দরীর চিত্র হইতে ক্রমাগত পর পর দর্শন করিয়া আসিলে সেই শ্রেষ্ঠা হইতে নিকৃষ্টা পর্য্যন্ত যে পার্থক্য আছে তাহা কিছুতেই উপলব্ধি হইবে না, কিন্তু শ্রেষ্ঠা হইতে একবারে নিকৃষ্টা দর্শনে তাহাদের পার্থক্য কাজ্জ্বল্যমান। হুয়েন্থসাঙ্গের দৃষ্টিও এইরূপ, তিনি মগধ হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত নৌকাযোগে নদীর উপর দিয়া গিয়াছেন, এবং প্রতি-দিনই নদীতীরস্থ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহা হইলে ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার পর পর চিত্র দর্শনের ন্যায় হইয়াছে; কিন্তু পরে তাম্রলিপ্তি হইতে উৎকল যাইবার সময় তাঁহাকে সমুদ্র পথে যাইতে হইয়াছিল সুতরাং তাম্রলিপ্তি ও উৎকলের মধ্যস্থিত কোন স্থানের লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে নাই, কাজেই ভাষার ক্রম তিনি দেখিতে পান নাই, তাই উৎকলের ভাষা তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠা হইতে একেবারে নিকৃষ্টার দর্শনের ন্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া বোধ হইল। তাই বলিয়াছি সপ্তম শতাব্দী হইতেই বাঙ্গালা ভাষা অল্পে অল্পে বিকশিত হইয়া আসিয়াছে। আমরা এক্ষণেও দেখিতে পাই হুগলী জেলার লোকের কথা এক প্রকার—বর্দ্ধমান জেলার কথা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন; মেদিনীপুর জেলার পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী স্থানের কথা তাহা অপেক্ষা বিভিন্ন, ক্রমে ঐ জেলারই পশ্চিম প্রান্তে সেই কথা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাহা হুগলী বা বর্দ্ধমান বাসীর বুঝিবার পক্ষে কঠিন; সেখানকার ভাষা যেন সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা। হুয়েন্থসাঙ্গের সময়ে যে ভাষার এরূপ

ক্রম ছিল না তাহা কে বলিবে? ও মধ্যস্থিত বাঙ্গালা দেশে যে পার্থক্য হইয়াছিল তাহা হইতেই যে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তাহাই বা না বলিব কেন?

এক্ষণে দেখিতে হইতেছে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; ইহা দেখিতে গেলে আমরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উপনীত হই; কেন না রাজা শিবসিংহ প্রদত্ত একটী তাম্র শাসন দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি ২৯৩ লক্ষ্মণ সংবতে কবিবর বিদ্যাপতিকে কতকগুলি উর্ব্বরক্ষেত্র প্রদান করেন, রাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন ১১০৭ খৃষ্টাব্দে মিথিলা করতলস্থ করিয়া যে সংবৎ প্রচলিত করেন তাহাই লক্ষ্মণ সংবৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা হইলেই ১১০৭+২৯৩ এই ১৪০০ খৃষ্টাব্দ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা হইলে কবিবরের এই ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান থাকাই সম্ভবপর। এক্ষণে দেখিতে হইতেছে সে সময়ে এদেশের সামাজিক অবস্থা কি প্রকার ছিল। তখন মুসলমানগণ এদেশের প্রভু—বঙ্গভূমি তখন স্বাধীন পাঠানরাজগণের করতলস্থ, তখনকার সমাজ আর জয়দেবীয় সমাজের ন্যায় নিশ্চেষ্ট—গতিহীন—ক্রিয়াহীন নহে; তখন সেই জীবন্মৃত সমাজের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক বেগ ছুটিয়াছে—যেন সেই অলস ও বাহ্যসৌন্দর্য্যমোহিত সমাজ কর্ম্মঠ হইয়াছে ও অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। এক্ষণকার সমাজ ইন্দ্রিয় পরবশ হইলেও আর ইন্দ্রিয়ের দাস নহে। যেন সমাজ বাহ্য প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ নষ্ট করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির ঈষৎ আভাস পাইয়াছে, জয়দেবের পূর্ব্ব হইতেই লোকের মনে নানাবিধ ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, বঙ্গবাসী ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই

বৌদ্ধরাজ, শৈবরাজগণের অধীনে থাকিয়া এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া ও পুরাণ, তন্ত্রের নানাবিধ কথা শুনিয়া এক প্রকার অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রায় সকল ধর্ম্মেই আস্থা শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল—সেই ধর্ম্ম ভাব শূন্য সময়ের কবি জয়দেব। তাই তিনি সাংখ্য-কারের পুরুষ প্রকৃতি ভেদ করিবের প্রকাশক, দার্শনিক ও মহা-কবি ভাগবৎকারের ভক্তিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকাকে লইয়া বিলাস রসে বিভোর—জঘন্য প্রেমের ভিখারী—ইন্দ্রিয়ের দাস—লম্পট স্বভাব কিশোর কিশোরী আঁকিয়াছেন—ইন্দ্রিয় চরি-তার্থের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই আনিয়াছেন—রাধাকৃষ্ণের মিলন যেন লম্পটের লাম্পট্য, আবার সেই জঘন্য চরিত্রের উপরই দেবত্বার আরোপ করিয়াছেন; ইহাতেই তখনকার লোকের ধর্ম্মভাব অক্লেশেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বিদ্যাপতির সময়ে সমাজ ভিন্ন প্রকৃতিক: এ সময়ে সমাজ আলস্যের দাস ও দুর্ব্বল থাকিলেও তাহাতে কিঞ্চিৎ বলাধান হইয়াছে; এ সময়ে রাজা মুসলমান, মুসলমানগণ ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত—অমিত বলবান ও সাহসী; সমাজ রাজার দৃষ্টান্তে অপেক্ষাকৃত বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে; আবার পাঠানরাজগণ ধর্ম্ম পিপাসু—হিন্দু সমাজে মহম্মদের বিজয় কেতন উড়াইবার চেষ্টা তাহাদের বলবতী; সুতরাং সে সময়ে সমাজ দোলায়-মান। হিন্দুগণ পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ ধর্ম্মের তাড়নে এক প্রকার ধর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার উপর মুসলমান-গণের প্রবল ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তাঁহাদের চক্ষের উপর নৃত্য করিতে লাগিল; হিন্দুসমাজ একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল; তখন কাতর স্বরে একবার সনাতন ধর্ম্মের দিকে চাহিল; কিন্তু

লোকে জয়দেবের লম্পট শ্রীকৃষ্ণে নিমজ্জিত—সেই ইন্দ্রিয় পর শ্রীকৃষ্ণই তখন সকলের আরাধ্য দেবতা; জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণে সার কিছুই নাই—তাই তাঁহার আরাধনায় লোকে নিশ্চেষ্ট ও ধর্ম্মহীন। আবার তখন সেই ইন্দ্রিয় সেবক শ্রীকৃষ্ণই লোকের মনে এরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে তাহা আর কিছুতেই সমাজ হইতে উৎপাটিত হইবার নহে। সমাজ যখন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত, সেই সময়ের ঈষৎ বলে বলীয়ান কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, লোকে এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণে নিমজ্জিত. তাই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, জয়দেবের সেই বিলাস রসে রসিক শ্রীকৃষ্ণকেই দেবতা বলিয়া তুলিয়া লইলেন,—কিন্তু তাহাতে আপনাদের কিঞ্চিৎ রসান মিশ্রিত করিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিলেন না, তাঁহারা তাঁহার সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ বুঝিলেন, সুতরাং তাহাদের কৃষ্ণ চরিত্রে বাহ্য মোহনীয় ভাব থাকিলেও তাহাতে অন্তঃপ্রকৃতির রঙ্গ ঢালিয়া দিলেন; কাজেই ইহাদের কৃষ্ণ ভিন্ন প্রকৃতিক হইয়া দাঁড়াইল। জয়দেবের সময় সুখের সময়—ভোগ তৃষ্ণার সময়—তখন বঙ্গদেশ যেন রাজাগণের শাসনে সুখে শয়ান, আর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের সময়ে বিধর্ম্মীগণ প্রভু—সুতরাং পরাধীনতার দুর্বিসহ যন্ত্রণা তখন সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, ও সেই সঙ্গে বঙ্গদেশে দুঃখ প্রবেশ করিয়াছে।) সুখের সময় লোকে যাহা দেখে তাহাতেই সন্তুষ্ট—তাহাতেই প্রফুল্ল হয়, তখন কাহারও ভিতরে প্রবেশ করিয়া সুখ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না—সকলই সুখময়—সুতরাং বাহ্যসৌন্দর্য্যই তখনকার প্রীতিপ্রদ। কিন্তু বিদ্যাপতির সময় দুঃখের সময়; এ সময়ে সুখ বঙ্গদেশ হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হই-

য়াছে, বাহ্য সকল পদার্থেই তখন দুঃখের অন্ধকার ছায়া আসিয়া পতিত হইয়াছে; তাই এ সময়ে সুখ বাহির করিতে হইলে বাহিরে বাহির হয় না ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। এবং এই জন্যই লক্ষ্মণ সেনের সময় বাহ্য শোভায় মোহিত ও ভোগ তৃষ্ণায় নিরত জয়দেব, আর অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ কিয়ৎ-পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই সময়ের কবি। আমরা দেখাইয়াছি জয়দেবের সময়ে জাতীয় জীবন এক প্রকার শিথিল হইয়া গিয়াছে, বিদ্যাপতির সময়ে, পীড়ন ও দুঃখের ভয়ানক নির্য্যাতনে সেই নির্ব্বাপিত জাতীয় জীবনের পুনর্দ্দীপন হইতেছে। বিদ্যাপতির সময়ে জাতীয় জীবনে ভক্তিবেগ সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তিনিই প্রথম সেই ভক্তিতের আভা দেখিতে পান ও দুঃখের কালে—দুঃখের গীত গাহিয়া সেই আভার প্রতি সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করেন। তাঁহার সেই হৃদয় আকর্ষণের অনিবার্য্য ফল, পর সময়ে চৈতন্য দেব। বিদ্যাপতি যে জাতীয় জীবনের ভক্তির প্রথম শিখা, তাহারই চরম ফল চৈতন্য দেব। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব ধর্ম্মের জোহন (John the Baptist), প্রটেষ্টাণ্টগণের উইক্লিফ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের বৃহস্পতি ও পার্কারের পূর্ব্ব রামমোহন। তাঁহাদের পশ্চাতেই বঙ্গদেশে চৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন. চৈতন্য দেব যে বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইবেন তাহা বলিবার অগ্রগামী দূত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস; সুতরাং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে যাহা থাকা সম্ভব জয়দেবে তাহা থাকিবে কেন?)

জয়দেবে কেবল ভোগতৃষ্ণা—কেবল বাহ্য শোভা; আদি রসের ভিতর যত রত্ন আছে, জয়দেবের তৎসমুদায়ই উপ-

করণ—ভাষার মধ্যে যতশক কুসুম আছে সে সকলই তাঁহার মালায় বিরাজমান—পৃথিবীতে যত কোমল ভাব আছে তাহা তাঁহার মালায় বিজড়িত)—বাসন্তীয় মৃদু মলয় হিল্লোল তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্রই বিরাজমান; সুতরাং তাঁহার কৃষ্ণ-রাধিকা বাহ্যিক প্রেম লইয়াই ব্যস্ত—কখন প্রেমের ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহাদের প্রেম যেন লালসা সম্ভূত—রূপজ মোহে মোহিত, তাহা হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ পথ পায় না; যেন সে প্রেমে কিছুমাত্র গভীরতা নাই। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে আসিতে বিলম্ব করিতেছেন, রাধিকার শয্যা কণ্টকী হইল; তিনি একবার উঠেন, একবার বসেন; একবার শয়ন রচনা করেন—আরবার বাহিরে যাইয়া দেখেন; কখন বা কাহারও পদ শব্দে চমকিয়া উঠেন—কখন বা সখীকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আবার আসিতে দেখিলেই মান করিয়া বসেন—পা'য় ধরিয়া সাধান, এই সকল চিত্র প্রেমের বাহ্যভাব মাত্র। বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের রাধিকা এমন অবস্থায় ছুটাছুটি করেন না; তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন—মর্ম্মভেদ চিন্তায় জর্জ্জরিত হন—তাঁহার বাহ্য দৃষ্টি লোপ হয়—তাঁহার কথা অন্তঃস্থলের নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত হয় ও তথা হইতে এক একবার দীর্ঘ নিশ্বাস স্বরূপ বাহির হয়। প্রেমের এই গভীর উচ্ছ্বাস লোকের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে। অন্তঃস্থলের ভাব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেমন আঁকিয়াছেন এমন আর কই? তাঁহারা দুঃখময় সমাজে বাস করিয়া যেমন দুঃখের কথা বলিয়াছেন এমন আর দেখিতে পাই না।)

বিদ্যাপতির রচনা হিন্দী বহুল; তিনি তাঁহার রচিত পদাবলীতে বহুল ব্রজ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাস

তাহা করেন নাই। বিদ্যাপতির কতিপয় কবিতা বঙ্গভাষায় থাকিলেও তিনি যেন হিন্দী লেখক ও চণ্ডীদাসের কবিতায় হিন্দী থাকিলেও তাঁহাকে সহজ দৃষ্টিতেই বঙ্গীয় লেখক বলিয়া প্রতীয়মান হয়) এবং বোধ হয় এই জন্যই বিদ্যাপতিকে কেহ কেহ মৈথিল কবি বলিয়াছেন। যাঁহারা বিদ্যাপতিকে মৈথিল কবি বলেন তাঁহারা আপনাদের মত সমর্থনার্থ আরও বলেন যে বিদ্যাপতি সমুদায় কবিতাই মৈথিল ভাষাতেই লিখেন, তবে পরে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার রচনা সকল সতত আলোচিত হইবার জন্য, তাঁহার কতিপয় গীতি বাঙ্গালায় হইয়া গিয়াছে: আবার এমনও কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বিদ্যাপতির সময়ে বাঙ্গালাভাষা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্ট হয় নাই; সেজন্য, মৈথিল ভাষা হইতে উৎপন্ন হইতেছে; তাই তাঁহার রচনায় এতাধিক ব্রজ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়; এতদুত্তরে আমরা বলি যদি বিদ্যাপতি তাঁহার সমুদায় পদ মৈথিল ভাষাতেই রচনা করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের সতত আলোচনা জন্য তাঁহার গীতির কতিপয় মাত্র বঙ্গ ভাষায় হইত না; বৈষ্ণবগণ তাঁহার সমুদায় গীতের আলোচনা করিতেন; তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় পদই বাঙ্গালা ভাষায় হইয়া যাইত। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, বিদ্যাপতি কেবল মৈথিল ভাষাতেই কবিতা রচনা করেন নাই। তিনি বর্ন্স (Burns) প্রভৃতি স্কটলণ্ডীয় কবির ন্যায় যেমন বিজাতীয় ভাষায় লিখিয়াছেন, সেই রূপেই স্বজাতীয় ভাষাতেও লিখিয়াছেন। যাঁহারা বিদ্যাপতিকে বঙ্গভাষার উৎপত্তি কালীন কবি বলেন তাঁহাদিগকে আমরা বলি, যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম-সাময়িক হইয়া, চণ্ডীদাস বিশুদ্ধ

বাঙ্গালায় তাঁহার প্রায় সমুদায় কবিতা লিখিতে সমর্থ হইতেন না।) তবে সত্যবটে চণ্ডীদাসেরও অনেক কবিতায় ব্রজশব্দ পরিদৃষ্ট হয; কিন্তু তাহার অন্য কারণ আছে, আমরা পূর্ব্বে বলিযাছি ব্রজলীলা ব্রজভাষায় যেমন মধুর লাগে এমন আর কোন ভাষাতেই নহে; এই জন্যই তিনি সামান্য মাত্র ব্রজশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; তিনি বিদ্যাপতির ন্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন না; সুতরাং বিদ্যাপতির ন্যায় বহুল বিদেশীয় শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অনেক পরবর্ত্তী কবি সকলও এই নিমিত্ত বহুল ব্রজশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ফলতঃ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ভাষার উৎপত্তি কালীন কবি হইলে তাঁহাদের উভয়ের রচনায় এতাধিক পার্থক্য হইত না; উভয়ের রচনা প্রায় সমান হইয়া যাইত। আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, বঙ্গভাষা সপ্তম শতাব্দী হইতে অল্পে অল্পে বিকসিত হইয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিকসিত হইয়াছে; বিদ্যাপতির সময ভাষার অনেকটা বলাধান হইয়াছে; তবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনায় এত পার্থক্য হইবার কারণ, বিদ্যাপতি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, চণ্ডীদাস তাহা ছিলেন না, সুতরাং বিদ্যাপতির রচনা গভীর ও ব্রজশব্দ বহুল এবং চণ্ডীদাসের রচনা কেবল ব্রজশব্দ বিরল; বিদ্যাপতির রচনা প্রায়শঃ ছন্দ পতন দোষ বিবর্জ্জিত, চণ্ডীদাসের প্রায়ই ছন্দদোষে দুষ্ট; কিন্তু বিদ্যাপতির রচনা শিক্ষিত পক্ষীর-শিক্ষিত মধুর কণ্ঠস্বরের ন্যায়—চণ্ডীদাসের রচনা বন্য বিহঙ্গমের স্বাভাবিক-সুন্দর-মধুর উচ্ছ্বাস।

এ স্থানে আর একটী কথা বলাও বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যে সময়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

আপনাদের প্রভায় বঙ্গভূমি আলোকিত করিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই ইংলণ্ডীয় প্রথম কবি জিয়োফ্রি চসর (Geoffrey Chaucer) তাঁহার কাণ্টরবরি (Canterbury Tales) কাব্য লিখিয়া ইংলণ্ড মাতাইতেছিলেন ও ইংরাজী সাহিত্যের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছিলেন। যে সময়ে ইংরাজী সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, প্রায় সেই সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি; যে সময়ে ইংলণ্ড কবির মুখ প্রথম সন্দর্শন করিয়াছেন, বাঙ্গালাও ঠিক সেই সময়েই গীতিকাব্যের রূপে মোহিত হইয়াছেন, কিন্তু এই দুই সাহিত্যের বয়স সমান হইলেও কি ইহাদের তুলনা হইতে পারে? কোথা কাব্য দর্শন বিজ্ঞানের আধার ইংরাজী সাহিত্য আপনার অলঙ্কারে জগৎ মাতাইতেছেন, আর কোথায় নিরলঙ্কৃতা বঙ্গীয় সাহিত্য চিরদিন একটানায় বহিতেছেন; ইংরাজী সাহিত্যে নাই এমন কোন বিদ্যাই নাই—আর বঙ্গীয় সাহিত্যে এক গীতিকাব্য ভিন্ন গৌরব করিবার আর কিছুই নাই; কিন্তু ইহার যথেষ্ট কারণ আছে। ইংরাজী ভাষা যে দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহা স্বাধীন জাতির স্বাধীন ভাষা; আর আমাদের বঙ্গভাষা জন্মগ্রহণের সময় হইতেই প্রায় পরাধীনের দুঃখের ভাষা; ইংলণ্ডের ভাষা প্রতি পদ-বিক্ষেপেই আশা ও উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছে—আর বঙ্গভাষা প্রতি পদক্ষেপেই নিরাশা ও নিরুৎসাহের জীবন্ত মূর্ত্তি পরিলক্ষিত করিয়াছে। তাই ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের সর্ব্বত্রই সুখের মূর্ত্তি—আহ্লাদ-উৎসাহের স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ—আর বাঙ্গালা সাহিত্য কেবল দুঃখের ভীষণ আকার ও পীড়নের হৃদয়দ্রবকারী উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। যে জাতি প্রথম হইতেই পরপদ লেহনে প্রমত্ত সে জাতির উন্নতি কোথায়?

সুতরাং জাতীয় জীবন যখন নিতান্ত শিথিল, তখন জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ আকাশ কুসুমবৎ অলীক। ইংলণ্ড চিরকাল স্বাধীনতার খনি—ইংলণ্ডের জাতীয় জীবন চিরদিন বিশেষ স্ফূর্ত্তিশালী; সুতরাং পরপদ লেহনে প্রমত্ত বাঙ্গালীর ও আত্ম-গৌরবে গৌরবান্বিত ইংরাজের সাহিত্য এক সময়ে জন্ম গ্রহণ করিলেও সমান হইবে কেন?) তবে আমরা এক্ষণে যে কালে সমুপস্থিত হইতেছি, সেই সময়ে বঙ্গদেশ পরাধীনতার দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিলেও, ভক্তির মাহাত্ম্যে সামান্য মাত্র উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল—একবার আহ্লাদ উৎসাহে নৃত্য করিয়াছিল—একবার সব ভুলিয়া, সকলকেই সমান—সকলকেই আপনার বলিতে পারিয়াছিল—তাই সে সময়ে ভাষার একটু উন্নতি দেখি। বিদ্যাপতিরই কিছুদিন পরে ভক্তিমাহাত্ম্যে বঙ্গবাসীগণের হৃদয়ের বন্ধন কিয়দংশে উন্মুক্ত হইয়াছিল: কিন্তু মানব হৃদয়ের বন্ধন মুক্ত হইলে, হৃদয়ের গতি বেগবতী হয়—ধর্ম্মের অনুপম উৎসাহে হৃদয় তরঙ্গায়িত হইলে তাহার গতি অতিশয় বলবতী হয়—এইরূপে সামাজিক হৃদয়ের গতি বেগবতী হইলে অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি সাধান হয়; বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম বিপ্লবের এইরূপ ফল ফলিয়াছিল।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর চৈতন্য দেবের কাল। চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; এবং সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমেই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।) এই সময়ে সমাজের অবস্থা কি প্রকার ছিল দেখিতে হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সমাজ বিদ্যা-পতির সময়ে সামান্যমাত্র আলোক দেখিতে পাইয়াছে—তখন সমাজে দুঃখ প্রবিষ্ট হইয়াছে—তদানীন্তন সমাজে দুঃখ অন্তঃ

সলিলা ফল্গুরন্যায় ধীরে ধীরে বহিতে ছিল; চৈতন্য দেবের সময়ে সেই অন্তঃস্থিত সলিল বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া বঙ্গের প্রতি নগর—প্রতি গ্রাম—প্রতি পল্লী—প্রতি গৃহময় ছড়াইয়া পড়িল; প্রতি গৃহে তাহা আপনার লহরী লীলা দেখাইতে লাগিল; বঙ্গভূমি সেই জল ক্রীড়ায় মোহিত হইয়া গেল—সে তরঙ্গ লীলা আর কিছুতে ভুলিতে পারিল না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বিদ্যাপতির সময়েব পূর্ব্ব হইতেই সমাজে ধর্ম্মভাব একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছিল—নানা প্রকার ধর্ম্মের তাড়নে বঙ্গভূমি ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছিল—বঙ্গভূমি কিছুদিন পূর্ব্বে বৌদ্ধ—শৈব—তান্ত্রিক প্রভৃতি নানাবিধ মত দর্শন করিয়াছিল। কথন বা জ্ঞান কাণ্ড—কথন বা কর্ম্মকাণ্ড প্রবল হইয়া সমাজে ভয়ানক কাণ্ড বাধাইতেছিল; সুতরাং কোন কাণ্ডেই লোকে অধিক আস্থা সম্পন্ন হইতে পারে নাই। এদিকে মুসলমান ধর্ম্ম প্রবল হইয়া লোকের মন প্রবলরূপে আকর্ষণ করিতেছিল; পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণগন শুধু ধর্ম্ম কেন, সকল বিষয়েই সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন; তাঁহাদেব কার্য্যের উপর কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার উপায় ছিলনা। হিন্দু রাজা, ব্রাহ্মণের পদানত—হিন্দুপ্রজা ততোধিক; অন্য সকলেই যেন ব্রাহ্মণের সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; সকলেই ব্রাহ্মণের নিকট অষ্টে পৃষ্ঠে আবদ্ধ; তুমি কোন অযথা কার্য্য-কর—ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই হইল, পরলোকে তুমি সুখের প্রয়াসী—ব্রাহ্মণের পদ পূজা কর,—তিনি ঈশ্বরকে বলিয়া কহিয়া তোমাকে স্বর্গে স্থান দেওয়াইবেন; ব্রাহ্মণ ছাড়িয়া তখন কোন কার্য্যই হইত না; ব্রাহ্মণের একাধিপত্য তখন সমাজে এইরূপ প্রবল ছিল। এদিকে মুসলমানগণের বিভিন্ন নীতি; মুসলমানগণও

স্বর্গলাভের অধিকারী কিন্তু তাহারা সকলেই নিজে ঈশ্বরার্চ্চনা করিয়া থাকে; এবং আপনারা এইরূপে উপাসনা করিয়াই ঈশ্বরে লীন হয়। সুতরাং মন হইতে লোকের ভ্রম ঘুচিল—এই সকল দৃষ্টে ব্রাহ্মণের ভয়ানক তাড়ন লোকের অসহনীয় হইয়া উঠিল। এই দোলায়মান সমাজে অনেকে স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ইসলাম্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন; আবার অনেকেই স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া মনে মনে তাহার অসারত্ব প্রতিপাদন করিতেছিলেন—ব্রাহ্মণের উপর সকলেরই বিতৃষ্ণা জন্মিল; কি উপায়ে স্বধর্ম্মে থাকিয়াই স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মচিন্তা করা যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবনে সকলেই সযত্ন হইলেন। ইসলাম্ ধর্ম্মের দৃষ্টান্তে জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছিল; এদিকে ঐশ্বরিক চিন্তা—পরলোক ভীতি লোকের মনে বরাবর সমান প্রবল; সমাজের এইরূপ অবস্থাতেই তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইয়া আপনার ক্রীড়া দেখাইয়াছিল; কিন্তু তান্ত্রিকোপাসনার অত্যাচার অধিক দিন সমাজে স্থায়ী হয় নাই; মহম্মদীয়ধর্ম্মের একেশ্বর বাদের নিকট পৌত্তলিকতা তিষ্ঠিতে পারিল না; লোকের চিত্ত টল টলায়মান; সুতরাং এই সময়ের বিশৃঙ্খল সমাজ সুশৃঙ্খলে আনিবার জন্য গৌরাঙ্গ অবতার প্রয়োজনীয় হইল। বিদ্যাপতির সময় যে অগ্নি অল্পে অল্পে প্রধূমিত হইতেছিল, এই সময়ে তাহা একেবারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; বিদ্যাপতির সময়ে যে একটি নক্ষত্র পূর্ব্বগগণে ঝিকি মিকি করিতেছিল, তাহা চন্দ্ররূপে মধ্যগগণে আসিয়া আপনার উজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিতে লাগিল; চৈতন্যচন্দ্র বঙ্গীয় আকাশে সমুদিত হইলেন। জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড বা যোগকাণ্ড ইঁহার নিকট অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইল; সকল

অনর্থের মূল জাতিভেদ প্রথা তাঁহার নিকট হইতে সুদূরে প্রস্থান করিল; ব্রাহ্মণ-শূদ্র, মহৎ-ক্ষুদ্র ইঁহার নিকট সমান আদরের পাত্র হইলেন—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলকেই তিনি সমান ইচ্ছায় আলিঙ্গন করিলেন; হিন্দু-মুসলমান সকলকেই সকল তত্ত্বের সার ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন; শ্রীমদ্ভাগবৎ যে তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া জগৎ মাতাইয়া ছিলেন—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যাহাতে অনুপ্রাণিত,—তিনি সেই ভক্তির তরঙ্গ লইয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রায় সকল লোকেই ভক্তি-শূন্য হইয়াছিল—এক্ষণে সকলেই ভক্তিস্রোতে গা-ভাসাইয়া দিল। কেবল বঙ্গে নহে, এই সময়ে এবম্বিধ কারণ বশতঃই পঞ্জাবে নানক জন্মগ্রহণ করিয়া শিখধর্ম্মের ভিত্তিসংস্থাপন করিতেছিলেন; আবার সুদূর পশ্চিমে মার্টিন লুথর এই সময়েই পোপের বিরুদ্ধে আপনার জ্ঞানাস্ত্র চালনা করিতে ছিলেন; সুতরাং সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, এই সময়ে যেন পৃথিবীময় একটি ধর্ম্ম সংস্কারের বাতাস পড়িয়াছিল।

চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় জাতীয় জীবনও উল্লাসিত ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া উঠে, উৎসাহ ও আশা সকলেরই হৃদয় অধিকার করে, সুতরাং এই সময়ের ভাষাও বিশেষ উল্লাসময় ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত। বঙ্গভাষা এই সময়ে বিশেষ পরিপুষ্ট হইবার একটি প্রধান কারণ আছে; ভাগবৎ যে ভক্তি-বীজ রোপণ করিয়া যান, চৈতন্যদেব তাহা মহাবৃক্ষে পরিণত করেন, এবং যাহাতে সকল লোকেই তাহার ছায়ায় বসিয়া সুশীতল হইতে পারেন, এইটিই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা; ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই যাহাতে ভক্তির সারমর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হয় এইটিই তাঁহার অন্তরের অভিলাষ; সুতরাং

তাঁহার উপদেশ বাক্য,সকলেরই সহজ বোধ্য হওয়া প্রয়োজনীয় —তিনি যে ভক্তির সার কথা বলিবেন তাহা সকলেরই সমান বুঝা আবশ্যক; সুতরাং পণ্ডিতের ভাষা তাঁহার পোষাইবে কেন? বহুকাল পূর্ব্বে মায়াদেবী সুত ধর্ম্মোপদেশ জন্য যে কারণ বশতঃ পালিভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই কারণ বশতঃই গৌরাঙ্গদেব অনুপম সংস্কৃতবিৎ হইয়াও বাঙ্গালাভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; বুদ্ধদেব তদানীন্তন বিশৃঙ্খল আর্য্যসমাজে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গদেব ইদানীন্তন বিশৃঙ্খল বঙ্গীয় সমাজে সেই কার্য্যই করিলেন;) বুদ্ধদেব যে জন্য পিতা, মাতা, পুত্র-কলত্র পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী, গৌরাঙ্গও সেই জন্যই স্নেহময়ী মাতা ও প্রণয়িণী পত্নী পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন-করঙ্গ-ধারী। আবার বুদ্ধদেব যেরূপে চিরপ্রাধান্য লাভেচ্ছু ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের অবতার বলিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়েন; গোরাঙ্গদেবও সেইরূপেই নারায়ণের অবতার বলিয়া কথিত এবং সেই রূপেই তাঁহার প্রিয় শিষ্য গোস্বামীগণ, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন; এইরূপেই রঘুনাথদাস গোস্বামী কায়স্থ হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; বুদ্ধদেব ও গৌরাঙ্গের জীবনী ঘটিত এইরূপ সুন্দর সৌসাদৃশ্য আছে। বুদ্ধদেব আপনার ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য মাগধী বা পালি ভাষার আশ্রয় লইয়াছিলেন, চৈতন্য দেবও সকলের সমান বুঝিবার জন্য বাঙ্গালাভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভাষাতেই তিনি ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন—এবং এই ভাষাতেই তিনি গ্রামে গ্রামে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।) সুতরাং তাঁহার অনুচরগণও যে এই ভাষার বিশেষ আদর করিবেন ও ইহাতেই নানা স্থানে

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিকই চৈতন্যদেব ও তদীয় নানা শিষ্য-প্রশিষ্য কর্ত্তৃক বঙ্গভাষা নূতন জীবন লাভ করিয়াছে; যে ভাষা এতদিন ধীরে ধীরে—অন্তরে অন্তরে বহিতেছিল, তাহা এখন দ্বিগুণ উৎসাহে বিশেষ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। সুতরাং এই সময়ে আমরা যত কবি দেখিতে পাই, এমন আর কোন সময়েই নহে; এই সময়ে নবীন উৎসাহে মাতিয়া নানা ব্যক্তি বঙ্গ-ভাষায় কবিতার তরঙ্গ দেখাইয়াছেন; আমরা যত বৈষ্ণব কবি দেখিতে পাই প্রায় তত্তাবৎই এই সময়ের লোক। চৈতন্য চন্দ্রের কিছুদিন পরেই বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য দেবের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন; চৈতন্যের জন্ম হইতে শরীর ত্যাগ পর্য্যন্ত তাঁহার যাবতীয় কার্য্যই তাহাতে প্রকটন করিয়াছেন; সুতরাং চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবৎ বৈষ্ণব-দিগের বিশেষ আদরের দ্রব্য; শুধু বৈষ্ণবগণের কেন, ইহা সকলেরই সমান আদরের ধন।) যে মহাত্মা বঙ্গ-সমাজের তেমন ভয়ানক উপপ্লবের সময় দারুণ বিপৎপাত হইতে সমাজ রক্ষা করিয়াছিলেন—যিনি কেবলমাত্র ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে সমভাবে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছিলেন—যিনি অক্লেশে যবন হরিদাসকে ভক্তিমাহাত্ম্যে বশীভূত করিয়াছিলেন ও যবন ভাবাপন্ন রূপ-সনাতন যাঁহার অনুগ্রহে আচার্য্য হইয়াছিলেন—যিনি অবাধে জাতিভেদ প্রথা রহিত—অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত করেন সেই মহা-পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত যে গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে, তাহা যে সকলেরই সমান আদরের ধন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবৎ কিছু সরল ও বিশদ; কৃষ্ণ-

দাসের চৈতন্য-চরিতামৃত কিছু কঠিন ও জটিল; কিন্তু এ দুয়েরই ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা—হিন্দী নাই বলিলেই হয়। তথাপি রচনায় ইঁহাদের বিশেষ পারিপাট্য কিছুই নাই; ভাষা যেন নিস্তেজ ও প্রায় সামান্য পয়ারেই গ্রথিত; যাহা হউক, ঠিক এই সময়ের ভাষা, বিশেষ বলবতী না থাকিলেও নিতান্ত স্ফূর্ত্তি বা শ্রীহীনা ছিল না; এই সময়েই ভাষার উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। এই সময়ে ভাষার নানাবিধ আলোচনে আমরা বহু বঙ্গীয় কবির দর্শন লাভ করি। রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবের সম-সাময়িক; ইঁহারা সংস্কৃত ভাষার বিশেষ আলোচনা করিলেও, বঙ্গীয় লেখক।) রূপ গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, ছন্দোঅষ্টাদশ প্রভৃতি কাব্য; উৎকলিকা বল্লী, গোবিন্দ বিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, প্রভৃতি স্তোত্র গ্রন্থ; বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব প্রভৃতি নাটক; দানকেলী প্রভৃতি ভানিকা; মথুরামাহাত্ম্য, পদাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, ভাগবতামৃত, ও ভক্তি রসামৃত সিন্ধু প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ রচনা ও সংগ্রহ করিলেও, তাঁহার প্রণীত রিপু দমন বিষয়ে "রাগময়কণ" নামক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ দেখিতে পাই। এইরূপ সনাতন গোস্বামী প্রণীত ভাগবতামৃত, হরিভক্তি বিলাস, লীলাস্তব ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার প্রণীত "রসময় কলিকা" প্রাপ্ত হই; শ্রীমজ্জীব গোস্বামী বৈষ্ণব তোষিনী প্রভৃতি নানা সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিলেও বঙ্গভাষায় "করচাই" রচনা করিয়াছেন। এইরূপে এই সময় হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালাভাষা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। চৈতন্য দেবের পূর্ব্ব হইতেই

বঙ্গদেশে পুনরায় সংস্কৃতের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে।) পণ্ডিত প্রধান বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নবদ্বীপে একটী চতুষ্পাঠী করেন। একই সময়ে তাঁহার চতুষ্পাঠীতে চৈতন্য, রঘুনাথ ও রঘুনন্দন পাঠার্থী ছিলেন; পরে রীতিমত শিক্ষিত হইয়া এই তিন ব্যক্তিই ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন—এই একই স্থান হইতে তিনটি ভিন্ন স্রোত প্রবাহিত হয়; একটী ধর্ম্মের স্রোত, অন্যটী ন্যায়ের স্রোত, ও অপরটী স্মৃতির স্রোত; এই তিন স্রোতে বঙ্গভূমি প্লাবিত হইল—সে জল আর শুকাইল না—তবে নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া এক্ষণে আর সে স্রোতের তেজ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই তিন স্রোতের আবর্ত্তনে সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষরূপে আলোড়িত হয়; সুতরাং সে সময়ে অনেকেই সংস্কৃতালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সেই আলোচনার ফল বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংস্কৃত গ্রন্থ; আবার চৈতন্য দেব নিজে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অতিশয় ভক্তি করিতেন সুতরাং তাঁহার শিষ্যগণ ইহার আলোচনা করিতেও নিরস্ত হন নাই; তাহারই ফল, রাগময় কণ, রসময় কলিকা, করচাই, চৈতন্য ভাগবৎ, চৈতন্য চরিতামৃত ও লোচনদাস প্রণীত চৈতন্য মঙ্গল ইত্যাদি। তবে এ সময়ের বাঙ্গালাভাষায় বিশেষ বলাধান হয় নাই; স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইলেও যেন তেজহীন।

চৈতন্য দেবের কাল অতিক্রম করিলে আমরা গোবিন্দদাসের কালে উপনীত হই; এই সময়ে আমরা নানা কবির দর্শন লাভ করিয়া থাকি। চৈতন্য দেবের সময় বা কিঞ্চিৎ পরেই চৈতন্য ভাগবৎ ও চরিতামৃত প্রণীত হয়; ইহাতে চৈতন্যদেবের জন্ম গ্রহণ হইতে লীলা সম্বরণ পর্য্যন্ত সমুদায়

কার্য্যই আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইয়াছে; ইহা তাঁহার জীবন চরিত। চৈতন্য দেবের জীবিতাবস্থায় তিনি সাধারণ লোকের নিকট গৌরাঙ্গ অবতার বলিয়া প্রতিপাদিত হন নাই; তিনি সে সময়ে কৃষ্ণভক্তপ্রধান লোক বলিয়া পূজিত হইলেও সাধারণতঃ অবতার বলিয়া উপসেবিত হন নাই; কিন্তু গোবিন্দদাসের সময় তিনি অবতার বলিয়া অভিহিত।) শ্রীকৃষ্ণ তাৎকালিকী হিন্দুগণের শোচনীয় অবস্থা প্রশমিত করিবার জন্যই স্বয়ং চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া, লোকের কলুষিত চিত্ত পাপ বিমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি গোবিন্দদাস সাময়িক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; তখন তাঁহার সমুদায় কার্য্যেই দেবত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সংসারের গতিই এইরূপ; পৃথিবীতে কোন অসাধারণ লোক জন্ম-গ্রহণ করিয়া, তাঁহার জীবিতাবস্থায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতে পারেন নাই; জীবিতাবস্থায় তাঁহারা বাতুল বা এইরূপই কোন অভিধানে অভিহিত হইয়া থাকেন; চারি দিকেই তাঁহার শত্রু বিরাজমান; এই শত্রুর হস্তে কখন কখন প্রাণ বিসর্জ্জনেরও দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। সক্রেটিস এই জন্যই হত— যীশুখৃষ্টের এই জন্যই ক্রুসে প্রাণত্যাগ—গালিলিও এই জন্যই বলিয়াছিলেন "পৃথিবী তুই এখনও ঘুরিতেছিস্, ক্ষান্ত হ'; নহিলে আমি কিরূপে সত্যের অপলাপ করি।" বুদ্ধদেব জীবিতাবস্থায় সাধারণতঃ তিরস্কৃত; উইক্লিফ বা লুথরের জীবদ্দশার বৃত্তান্তও এই প্রকার—মহম্মদকে এই জন্যই জন্মস্থান হইতে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। এইরূপে আমরা যে কোন ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের বিষয় আলোচনা করি না তাহাতেই এই সত্যটি দেখিতে পাইব; তবে অলোকীক গুণ সম্পন্ন চৈতন্য দেব কেনই বা

না এরূপে বিড়ম্বিত হইবেন? কিন্তু অন্যান্য মহাপুরুষগণ যে ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, চৈতন্যদেব ততদূর নহেন—অন্যান্য মহাপুরুষগণ যেমন জীবিতাবস্থাতে দেশের শত্রু ও অনেকের ঘৃণ্য হইয়াছিলেন চৈতন্যদেব তাহা হন নাই; তিনি যে সময়ে নিজের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকরূপে ছাত্রগণকে সকল শব্দেরই অর্থ হরি বলিয়া প্রতিপন্ন করতঃ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, সে সময়েও যেমন সকলের ভক্তির ধন—আর যৎ-কালে কৌপীন করঙ্গ ধারণ করিয়া নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, দ্বারে-দ্বারে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন ও "প্রেম ধর ধর লওরে" বলিয়া সকলকে আহ্বান করিতেন, তখনও তিনি সেইরূপ ভক্তির ধন। যাহা হউক তিনি সে সময়ে লোকের এতাদৃশ ভক্তির পাত্র হইলেও অবতার বলিয়া অভিহিত হন নাই; গোবিন্দদাসের সময়েই তিনি পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং এই জন্যই এই সময়ের কবিগণ, যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণন করিয়াছেন---সেই ভাবেই গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলাও বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের সময়ে বঙ্গদেশ বৈষ্ণবময়; শুধু বঙ্গদেশ কেন উৎকল, মগধ, বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা এই সকল স্থানেই তখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের তান উঠিয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলে রামানন্দ যে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া-ছিলেন এক্ষণে তাহাতে চৈতন্যের ভক্তি তরঙ্গ প্রবেশ করি-য়াছে। চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্যদ্বয় রূপ ও সনাতন, তাঁহার তিরোধানের পর বৃন্দাবন ও মথুরার অনেক গুপ্ততীর্থ আবিষ্কার করেন ও তথাকার লোককে চৈতন্যদেবের ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইয়া দেন; তদবধি তথায় চৈতন্যদেবের প্রাধান্য হই-

য়াছে—এক্ষণেও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চৈতন্য ধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছেন। যাহা হউক গোবিন্দদাসের সময়ে বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেই চৈতন্য দেবের উপাসক; বিশেষতঃ প্রেমময়ী বঙ্গীয়া ললনাগণের তিনিই একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিলেন; এক্ষণেও অধিকাংশ প্রাচীনা বঙ্গীয়া রমণী গৌরাঙ্গের উপাসনা করিয়া থাকেন। গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গের একজন প্রধান ভক্ত থাকিলেও তাঁহার রচিত অধিকাংশ গীতই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা সংক্রান্ত; কিন্তু তাঁহার সম-সাময়িক প্রেমদাস—বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি কবিগণ অধিকাংশ চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা বর্ণন করিয়াছেন; তবে গোবিন্দদাস যে চৈতন্য লীলা বর্ণনা করিতে একেবারে নিরস্ত হইয়াছেন তাহা নহে—তাঁহারও গৌরাঙ্গলীলা বর্ণন অনেক আছে; তিনি আচার্য্য সহ চৈতন্যের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। যাহা হউক, এই সময়ে আমরা অনেক বৈষ্ণব কবির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকি; রায় শেখর, রায় বসন্ত, নরোত্তম দাস, নরহরি দাস, বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, বৈষ্ণব দাস, যদুনন্দন, রামানন্দ বসু, প্রেমদাস, বাসুদেব ঘোষ, প্রসাদ দাস, ভীম দাস, গোবিন্দ দাস, কৃষ্ণদাস, রসময় দাস, বংশীদাস, পীতাম্বর দাস, গোপাল দাস, বল্লভ দাস, সুখময়দাস, লোচন দাস, প্রভৃতি শত শত কবি জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সময়ে বঙ্গভূমি প্লাবিত করিয়াছেন; বাস্তবিক এই সময়ে আমরা যত বৈষ্ণব কবি দেখিতে পাই, এত আর কখনই নহে। আমরা উপরে যে সকল মহাজনের নামোল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই যে গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী ছিলেন তাহা নহে, অনেকে তাঁহার পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলেন।

এক্ষণে দেখিতে হইতেছে গোবিন্দদাস কোন্ সময়ের লোক; ইহার অনুধাবনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।) প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, তিনি ১৪০৯ শকে বা ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে লোকলীলা সম্বরণ করেন তাহা হইলে আমরা উপরে যে সকল কবির নামোল্লেখ করিয়াছি তাঁহারা এই সময়ে বা তাহার কিছু পরে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুমধুর পদাবলীতে লোকের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছেন; আমরা প্রস্তাবান্তরে এই সকল কবির বিষয় আলোচনা করিব। যাহা হউক এই সময়ে বঙ্গ-দেশের লৌকিক অবস্থা অতীব রমণীয়; বঙ্গের যে স্থানে যাও সেই স্থানেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনা—সেই স্থানেই প্রেমের লহরী-লীলা খেলিতেছে—সেই স্থানেই বৈষ্ণব কবিগণ কোমল-কান্ত-পদাবলীতে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। তখন যেন সকলই প্রেমময়—সকলেরই হৃদয়ে প্রেমের উৎস স্ফুরিত হইতেছে। এই সময়টীই বৈষ্ণব ধর্ম্মের চরম কাল; ইহার পরই ক্রমিক অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।) ব্রাহ্মণগণ হিন্দু-সমাজের প্রথম অবস্থা হইতে তাহার উপর একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন; মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট পরাজিত হইলেও পুনরায় আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ করিতে পারিয়াছিলেন; এক্ষণে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আবার ব্রাহ্মণের কৌশল জাল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিল; তাহা ব্রাহ্মণগণের অসহনীয়; সুতরাং তাঁহারা এই ধর্ম্মের সূত্রপাত হইতেই ইহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন; কিন্তু বৈষ্ণবগণের নবীন উচ্ছ্বাসের সময় তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই;

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহারা পুনরায় আপনাদের প্রাধান্য খ্যাপন করিতে সমর্থ হইলেন; বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামীগণ ব্রাহ্মণের মধ্যে গণ্য হইয়া গেলেন; সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্ম সেই অবধি এক সঙ্কীর্ণ পথে, মন্থর গতিতে গমন করিতেছে—আর সে তেজ নাই—সে উৎসাহ নাই, যেন নিতান্ত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাবল্যের সময়ই তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব; বৈষ্ণব ধর্ম্ম তন্ত্রের আসুরিক ভাবের নিকট আপনার প্রেম ভাব অক্ষত রাখিতে পারিল না; সুতরাং এই সময় হইতেই আমরা বৈষ্ণব কবির সমধুর তান শ্রবণে বঞ্চিত হইলাম; তত্রাপি লোকের হৃদয় কন্দরে এক্ষণেও যে বৈষ্ণব কবিগণ বিরাজ করিতেছেন তাহা বলা বাহুল্য। অধুনা বঙ্গবাসী যে অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা গীতি কাব্যের অধিক প্রিয় তাহার কারণ, বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবির গীতি নিচয়ের স্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে; যতদিন বঙ্গভাষায় গীতি কাব্য রচিত হইবে—যতদিন বঙ্গবাসী গীতি কাব্যের অধিক আদর করিবেন, ততদিন বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের মান্য কিছুতেই অন্তর্হিত হইতেছে না।

যাহা হউক, বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিবৃন্দ যে বঙ্গভাষার অনেক অঙ্গ সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; তাঁহাদের যত্নবারি সিঞ্চিত না হইলে বঙ্গসাহিত্য অকালেই লয় প্রাপ্ত হইত; ইহা জন্ম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব কবিগণেরই অঙ্কে লালিত ও পালিত হইয়াছে; তাঁহারাই ইহার শৈশব সংস্কার বিধান করিয়াছেন—এবং তাঁহাদের সোহাগ ও আদরেই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া ইহা এক্ষণে সকলের নয়নাকর্ষণ করিতেছে। তাহাদের নিকট আমাদের ভাষা

বিশেষ ঋণে ঋণী।) আমরা যে এক্ষণে আমাদের নিজের ভাষায় সকল প্রকার কথোপকথন করিতে পারিতেছি ইহা তাঁহাদেরই অনুগ্রহে ; না হইলে আমাদের মাতৃভাষায় আমরা এক্ষণেও সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম কি না, কে বলিতে পারে? যখন বৈষ্ণব কবিকুল ইহার প্রতি অনুকূল নেত্রে সন্দর্শন করেন—তখনও মুসলমানগণ বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা ; তাঁহাদের ভাষা বিভিন্ন ; তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে হইলে উর্দ্দু বা পারসীর সাহায্য লইতে হইত—তখন সমুদায় বিচার কার্য্যই পারসী ভাষাতে সম্পাদিত হইত ; সুতরাং সাধারণ লোকে তখন পারসী ভাষারই প্রতি অনুরক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয় ; আবার পণ্ডিতগণ সংস্কৃতের আলোচনা করিতেন ; সুতরাং সে সময়ে কেবল বৈষ্ণব কবিগণই ইহার উপর সদয় ছিলেন—এবং তাঁহাদের এই সদয় ব্যবহারের জন্যই বাঙ্গালাভাষা আজিও জীবিতা রহিয়াছে ও দৈনন্দিন ইহার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল করিতেছে। বৈষ্ণবগণের অধঃপতন, রাজ-বিপ্লবের সময়েই সংঘটিত হয়। যে সময়ে বঙ্গরাজ্য লইয়া মোগল পাঠানে বিবাদ, সেই বিবাদের সময়েই বঙ্গ সমাজে ধর্ম্ম বিপ্লবও ঘটিয়া উঠে ; আবার তাহার কিছুদিন পরেই বঙ্গদেশ পুনরায় ব্রাহ্মণের কৌশলে অভীভূত হইয়া পড়েন ; সেই সময়েই বৈষ্ণব কবিগণ সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন ; সুতরাং আমরাও এইস্থলে বৈষ্ণব কবিগণকে বিদায় দিয়া নূতন কালে উপনীত হইতেছি। কিন্তু ইহাদিগকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে এই সময়ে দেশের অবস্থা কি প্রকার ছিল একবার দেখিতে হইতেছে। মুসলমানগণ সমুদায় ভারতের অধীশ্বর ; দিল্লীতে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট

আসীন; বঙ্গদেশে মোগল ও পাঠান উভয়েই জয়শ্রী পাইবার নিমিত্ত লালায়িত; কখন বা মোগল জয়ী—কখন বা পাঠান জয়ী; সুতরাং তখন কেহই নির্ব্বিবাদে স্বীয় আধিপত্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। পাঠান অধিকৃত সময়ে বঙ্গদেশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছিল; পাঠানরাজ বঙ্গীয় জায়গীরদারগণকে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজা করিয়াছিলেন; ইঁহারা সকলেই আপনাপন আবশ্যক মত সৈন্য রাখিতে পারিতেন এবং সুবিধা হইলে ইহাদের মধ্যে কেহ প্রবল হইয়া অন্য জায়গীরদারের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেন; এবং কখন কখন দিল্লীশ্বরের প্রাধান্যও অস্বীকার করিতেন। এই জমিদার গণের সৈন্যবল নিতান্ত কম ছিল না; আইন আকবরীতে লিখিত আছে যে, সুবা বাঙ্গালার অধিকাংশ জমিদার কায়স্থ; এবং তাঁহারা যুদ্ধকালে ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী,৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৭০ হস্তী, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকেন (৬)। এতদ্দৃষ্টে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, বঙ্গীয় জমিদারগণ নিতান্ত সামান্য ছিলেন না। এই সময়েই বঙ্গে দ্বাদশ ভৌমিক (বার ভুঞা) গণ রাজত্ব করিতেন। পশ্চিম বাঙ্গালায় বিষ্ণুপুরাধিপতি; উত্তর বাঙ্গালায় কুচবিহারাধিপতি; পূর্ব্ববাঙ্গালায় ত্রিপুরাধিপতিগণ এ সময়েও আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিলেন; প্রধান প্রধান জমিদার ছাড়িয়া দিলে, ক্ষুদ্র

---

(৬) "The zemindars (who are mostly Kiots) furnish also 23,330 cavalry, 801,158 infantry, 170 elephants, 4260 cannon and 4400 boats."

Gladwin's Ain Akbari Vol, II.

ক্ষুদ্র জমিদারগণও বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন, ও অনেক লস্কর, পাইক রাখিতেন বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং দাঙ্গা, হাঙ্গামা তখন নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের মত ছিল। এই ভয়ানক সময়ে যে, দেশের সাধারণ প্রজাবর্গ বিশেষ রূপে প্রপীড়িত হইতেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? সে সময়ে দেশময় এক প্রকার অরাজকতা প্রশ্রয় পাইয়াছিল। কোন বলবান্ প্রজা কোন দুর্ব্বল প্রতিবেশীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লইলে তাহার বিচার করে কে? আবার তখন রাজকর্ম্মচারীগণের পীড়ন অত্যধিক ছিল। যখন সম্রাট কুলতিলক আকবর সাহের সুশাসন কালে, ও সদাশয় মহারাজ মানসিংহের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়াও বর্দ্ধমান প্রদেশ মামুদ সরিফের ন্যায় দুর্দ্দান্ত কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, তখন আর অন্য সময়ের কথার প্রযোজন কি? তখন অন্য সময়ে প্রজাগণ যে কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা পাইতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। তখন হিন্দু প্রজার উপর জিজিয়া কর গ্রহণ করা হইত—তাঁহাদের জমির আঠার কাঠায় বিঘা ধরা হইত—তাঁহাদের ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তর জমি জমাই বলিয়া গণ্য করা হইত, এইরূপ অত্যাচারের শত শত দৃষ্টান্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের স্মৃতিপটে সমুদিত হয়। যখন আকবর সাহের সুশাসন কালেও রাজকর্ম্মচারীর দৌরাত্ম্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কবিকঙ্কণ সাত পুরুষের বাস্ত ভিটা ও স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন আর অন্য সময়ের কথায় কাজ কি? হিন্দুগণের বাস্ত ভিটার প্রতি যে কিরূপ মমতা, তাহা সকলেই অবগত আছেন; হিন্দুগণ উদর জ্বালায় সমুদায় বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু সাত পুরুষের বাস্ত ভিটাটি ত্যাগ করিতে পারেন না; কোন হিন্দু

সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া দূরতর দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেও, অন্যের অজ্ঞাতসারে আপনার সাত পুরুষের ভিট্টাটি একবার দেখিতে আইসে; না হইলে তাঁহার সন্ন্যাস ধর্ম্মে পুণ্যোপার্জ্জন হয় না ইহাই বিশ্বাস। যে জাতির পৈতৃক বাস্তু ভিট্টার প্রতি এতাধিক মমতা, সেই হিন্দুই যখন (যৎকালে তাহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া এখনকার মত কুসংস্কারচ্যুত হয় নাই) অক্লেশে বাস্তু ভিট্টা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, তখন যে বঙ্গবাসী তৎকালে কি অসহ্য যন্ত্রণা পাইতে ছিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। যৎকালে তাঁহারা এইরূপে পীড়িত তখন তাঁহাদের মানসিক শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইবে কোথা হইতে? তখন তাঁহাদের মানসিক শক্তির সম্পূর্ণ হ্রাস হওয়াই সম্ভবপর। দারিদ্র্য দশায় কবির শক্তি বিশেষ স্ফূর্ত্তিমতী হইতে পারে না; ঘটকর্পরের "দারিদ্র্য দোষো গুণ রাশি নাশী" বা কালিদাসের "কাতরে কবিতা কুতঃ" কথা গুলি স্মরণ হয়; কাতর অবস্থায় কবির শক্তি পূর্ণ বিকাশ পায় না; কবি যখন আপনার দুঃখেই ব্যতিব্যস্ত, তখন তিনি অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শন করিবেন কি প্রকারে? আমাদের শাস্ত্রে বলে "পৃথিবীতে নর জন্ম দুর্লভ, তাহাতে বিদ্যালাভ করা আরও দুর্লভ, আবার তাহাতে কবিত্ব প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুর্লভ, আবার কবিত্ব লাভ হইলেও তাহাতে শক্তি থাকা নিতান্ত দুর্লভ।" কবিত্ব শক্তি যখন এতাদৃশ দুর্লভ বস্তু, তখন তাহা পীড়িত দশায় পাওয়া যাইতে পারে কি? কিন্তু বঙ্গদেশের এমন দুঃসময়েও আমরা দুই জন প্রকৃত কবির দর্শন লাভ করিয়া থাকি; প্রথম, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও দ্বিতীয় কৃত্তিবাস পণ্ডিত। একজন স্বকপোল-কল্পিত কাব্য লেখক, অন্যজন

ভগবান্ বাল্মিকীর প্রিয় সেবক ও অনুবাদক। উভয়েই মহাকবি; কিন্তু সমাজের দোষে তাঁহাদের কাব্য প্রকৃত মহাকাব্য হইতে পারে নাই। তাঁহারা যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সে সময়ের চিত্র এক প্রকার দেখাইয়াছি সুতরাং সেই কুসময়ে—সেই বঙ্গবাসীর নিগ্রহ সময়ে—সেই নিস্তেজ অবস্থায় তাঁহাদের কাব্য বীর-রস পাইবে কোথা হইতে? সুতরাং তাঁহারা যেখানে বীর রসের অবতারণা করিতে গিয়াছেন সেই স্থানেই কেবল কতকগুলি শব্দের অবতারণা করিয়াছেন মাত্র—সে বর্ণন শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় না—নিশ্বাসে অগ্নিকণা বহির্গত হয় না—হৃদয় উর্দ্ধোত্থিত হয় না—মনে কোন ভাবেরই উদয় হয় না, যেন কি পড়িলাম—কি শুনিলাম; বাস্তবিকই এই স্থলে তাঁহাদের প্রকৃত শক্তি তিষ্ঠিতে পারে নাই। তত্রাপি তাঁহারা যে অদ্বিতীয় কবি ছিলেন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সময়ে ইহারা দুইজন ব্যতীত গীতি কাব্য প্রণেতা দুই চারিজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন, কিন্তু আমরা কার্য্য সৌকর্য্যার্থে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহাদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ না করিয়া, তাঁহাদিগকে এক সমাজ স্থিত বলিয়া গোবিন্দদাসের কালে ধরিয়া লইয়াছি; এক্ষণে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া আমরা নূতন কালে সমুপস্থিত হইতেছি।

বৈষ্ণব কবিগণের সময় পরিত্যাগ করিলে আমরা কবিকঙ্কণের কালে সমুপস্থিত হই; অনেকে বলেন কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী; কিন্তু এ বিষয়ে আমরা এখনও স্থিরচিত্ত হইতে পারি নাই; তাহার কারণ পরে প্রদর্শিত হইবে। তবে যখন কবিকঙ্কণকে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পরবর্ত্তী বলিয়া অনেকের মনে ধারণা আছে, তখন আমরা কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাসকে

সম-সাময়িক বলিয়া ধরিয়া লইলাম। আমরা এই স্থলে কবি-কঙ্কণ ও কৃত্তিবাসের কথা বলিবার অগ্রে আর এক সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। বৈষ্ণব কবিগণের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গদেশে কথকতার সৃষ্টি হয়; বৈষ্ণব কবিগণ যাহা রচনা করিতেন তাহা পণ্ডিতগণের আলোচ্য, কিন্তু কথকতা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই হৃদয়াকর্ষক ;) কবিগণের মধুময়ী কবিতানিবহ সঙ্কীর্ত্তনের প্রধান সহায় ও পণ্ডিতগণেরই বোধ্য—কথকতার সুন্দর রাগ-রাগিণী সংযুক্ত মধুর কথা ও গীত, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই সমান আদরের ধন; সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় পণ্ডিতগণের জন্য যেমন সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি, তেমনই আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হৃদয়াকর্ষণের নিমিত্ত কথকতার উৎপত্তি। বৈষ্ণবকবি তখন প্রায় বঙ্গদেশের সকল স্থলেই বিরাজিত ছিলেন—এদিকে মনোহর পদবিন্যাসী মধুর গায়ক কথক-বৃন্দও তখন বোধ হয় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রভা বিকীর্ণ করিতেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি মহাজনের মোহন কবিতা নিচয় যেমন সঙ্কীর্ত্তনের প্রধান অবলম্বন—ভক্তি রসাপ্লুত শ্রীমদ্ভাগবৎ সেইরূপ কথকগণের প্রধান সাধন; কথকতার সৃষ্টি কিরূপে কখন হয় তাহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় না। বাবু ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার প্রণীত "সেই এক দিন, আর এই এক দিন" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোণামুখী গ্রাম নিবাসী গঙ্গাধর শিরোমণি একজন উত্তম গায়ক ও ভাগবৎ ব্যাখ্যাতা ছিলেন—তিনি নানা স্থানে শ্রীমদ্ভাগবৎ ব্যাখ্যা করিয়া বেড়াইতেন ও যেখানে যাইতেন সেই খানেই তাঁহার উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইত; একদা

কোন স্থানে তিনি এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবৎ ব্যাখ্যা করিতেছেন কিন্তু সে দিন তথায় অধিক লোকের সমাগম হয় নাই; ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জ্ঞাত হইলেন যে, নিকটেই কোন এক স্থানে রামায়ণ গান হইতেছে; লোক সকল সেই স্থানেই যাইতেছে। গঙ্গাধর নিজে একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন; তিনি তাঁহার ব্যাখ্যা অপেক্ষা গানের চিত্তাকর্ষণী শক্তি অধিক বুঝিয়া সকলকে বলিয়া দিলেন, আগামী কল্য হইতে আমার নিকট শ্রীমদ্ভাগবৎ গান শুনিতে পাইবে। এই কথা বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পরদিনের ব্যাখ্যেয় স্থল, স্বকপোল-কল্পিত কথকতায় পরিণত করিলেন। পরদিন যথাসময়ে বেদীতে উপবেশন পূর্ব্বক তান-লয় স্বরে ভাগবৎ গান আরম্ভ করিলেন; চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপে তিনি ধ্রুব চরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র, বামন ভিক্ষা প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ সকল কথকতায় পরিণত করিয়া নূতন ভাবের গীত আরম্ভ করিলেন; ক্রমশঃ রামায়ণ—মহাভারত পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইল (৭) কথকতার কতকগুলি বর্ণনা বেশ প্রীতিপ্রদ; প্রভাত বর্ণনা, মধ্যাহ্ণ বর্ণনা—সায়াহ্ণ বর্ণনা—যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতি বর্ণনা গুলি অতিশয় চিত্ত-হারিণী; গঙ্গাধর শিরোমণি কতদিনের লোক তাহা আমরা বলিতে পারি না এবং তিনিই এইরূপে কথকতার সৃষ্টি করেন কি না সে বিষয়েও আমরা কোন কথা বলিতে পারি না, তবে এইমাত্র বলি, কথকতার রীতি যে বহু প্রাচীন

৭। শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" ৬৩ পৃষ্ঠা।

তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেন না আমরা দেখিতে পাই কৃত্তিবাস ও কাশীদাস উভয়েই কথকগণের নিকট হইতেই মর্ম্মজ্ঞাত হইয়া নিজ নিজ কাব্য রচনা করিয়াছেন; কৃত্তিবাস যে কথকতা শুনিয়া রামায়ণ রচনা করেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থে একাধিক স্থলে উল্লেখ আছে; সুতরাং কৃত্তিবাসের সময়ের অনেক পূর্ব্বেই যে কথকতার উৎপত্তি তাহাতে আর সন্দেহ কি? কৃত্তিবাস খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন, তাহা হইলে কথকতা যে সেই সময়ে কিম্বা তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কথকগণ অধিকাংশ গদ্য ও মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি গীত গাহিয়া থাকেন; পূর্ব্বে যে এরূপ নিয়ম ছিল না তাহা কে বলিতে পারে; পূর্ব্বকালে এখনকার মত ঠিক না থাকিলেও যে তাঁহারা গদ্য পদ্যময় গীতি ব্যবহার করিতেন, তাহা "কথকতা" শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিলেই জানা যায়। তাহা হইলে আমরা যে সতত অনুযোগ করিয়া থাকি যে, ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে এদেশে কোন গদ্য গ্রন্থকার ছিলেন না তাহা সত্য নহে; ব্রিটিস রাজত্বের পূর্ব্বে অপর কোন গদ্য গ্রন্থকার না থাকিলেও যে, কথকগণ বর্ত্তমান ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই? সুতরাং তখন গদ্য রচনাও সমাজে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল; তবে কথকগণ গদ্য রচনাও সময়ে সময়ে তান-লয় সুর-সংযোগে পদ্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা গদ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা হইলেই গদ্য রীতি যে আধুনিক কালের তাহা নহে; তবে যে কেন আমরা পূর্ব্বকালের কোন বঙ্গীয় গদ্য লেখক দেখিতে পাই না তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। অতি পুরাকাল হইতে

ভারতবর্ষে পদ্য রীতিরই অধিক প্রচলন আছে; কি ইতিহাস কি ভূগোল, কি দর্শন—কি বিজ্ঞান সমুদায়ই লিখিবার সময় আর্য্য-ঋষিগণ পদ্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; তাহার কারণ পদ্যে যত শীঘ্র মন আকৃষ্ট হয় ও লোকের মনে উত্তম রূপে অঙ্কিত হয়, গদ্যে তত নহে। সেই জন্য ঋষিগণ গদ্য অপেক্ষা পদ্যেরই অধিক পোষকতা করিয়াছেন—সেই জন্যই ভূরি ভূরি সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে দুই চারি খানি গ্রন্থ মাত্র পদ্যে লিখিত। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি কোমল ভাষা; গীতি কাব্যই ইহার প্রাণ; রাধাকৃষ্ণের চরণ হইতেই ইহার উৎপত্তি; রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনাই ইহার সর্ব্বস্ব; সেই প্রেম ভাব সকলের মনে অঙ্কিত ও উজ্জীবিত রাখিবার জন্য, কেন না পদ্য প্রথা অবলম্বিত হইবে? তত্রাপি আমরা দেখিতে পাই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ অধিকাংশ গীতি রচনা করিলেও, দুই চারিটি গদ্য লিখিতেও বিরত হন নাই; যদিও তাঁহাদের রচিত গদ্য কাব্য এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য অথবা একেবারেই অপ্রাপ্য, তথাপি তাঁহারা যে গদ্য রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে যে আমরা তাঁহাদের রচিত কোন গদ্য রচনা পাই না, তাহার কারণ বঙ্গীয় সাধারণ লোকের অনবধানতা, ঔদাসীন্য ও আস্থা শূন্যতা। কেন না, তাহাদের যে সকল রচনা মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছে ও মনের সহিত বেশ মিলিয়াছে সাধারণ লোকে তাহাই নকল করিয়াছিলেন, সুতরাং বিদ্যাপতি প্রভৃতির রচিত গদ্য রচনা লোকের ঔদাসীন্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আবার চিরাভ্যাস বশতঃ লোকের পদ্যের প্রতি যেরূপ আস্থা ও ভক্তি গদ্যের প্রতি তত নহে, কাজেই গদ্য লেখা গুলি অবহেলিত হইয়া ক্রমশঃ লোপ

পাইয়াছে। আমরা এক্ষণে আর কোন উপায়েই বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস রচিত গদ্য লেখা হস্তগত করিতে পারি না, কিন্তু গোবিন্দদাসসমাজে তাঁহাদের গদ্য রচনাও প্রচলিত ছিল: গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রচিত বহুল গদ্য রচনা পাঠ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই তিনি বিদ্যাপতি প্রভৃতির বন্দনাস্থলে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন; বিদ্যাপতির গদ্য রচনা সে সময়ে প্রচলিত না থাকিলে কখনই তিনি তাহা উল্লেখ করিতেন না। আমরা এই স্থলে গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণ যেরূপে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গদ্য রচনার উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি বন্দনাস্থলে লিখিয়াছেন;—

যত যত রস-পদ কর লহি বন্ধে।
কোটি হি কোটি, শ্রবণ পর পাইয়ে,
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্ধে।
সোরস শুনি নাগর বর নারী।
কিয়ে কিয়ে করেচিত, চমকয়ে ঐছন,
রসময় চম্পূ বিথারি॥ ইত্যাদি।

চম্পূ শব্দের অর্থ গদ্য পদ্যময় কাব্য; তাহা হইলে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি প্রণীত গদ্য পদ্যময় কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন;) আরও দেখিতে পাই, বৈষ্ণব কবি বৈষ্ণবদাস কবি বন্দনাস্থলে এই কথা বেশ বিশদ করিয়া লিখিয়াছেন; আমরা এই স্থলে তাহা গ্রহণ করিলাম,—

জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি,
বিদ্যাপতি রসধাম।

জয় জয় চণ্ডীদাস, রস শেখর,
অখিল ভুবনে অনুপাম ॥
যাকর রচিত, মধুর রস নিরমল,
গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌর চন্দ্র, আস্বাদিল
রায় স্বরূপ সহিত। ইত্যাদি।

ইহাতেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পদ্যের ন্যায় অনেক গদ্যও রচনা করিয়াছিলেন; তবে সে সকল লোকের প্রবৃত্তি অনুসারে ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক, যখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গদ্য রচনার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে, তখন ভাষার প্রথম হইতেই যে গদ্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয; (বিদ্যাপতির সময়েই গদ্য ও পদ্য রীতি উভয়ই প্রচলিত হইয়াছিল এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেমন বঙ্গভাষার আদি পদ্য লেখক তেমনই তাঁহারা ভাষার প্রথম গদ্য লেখক।) আমরা বহুল অনুসন্ধানে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ হস্তগত করিতে না পারিলেও চৈতন্যচন্দ্র সম-সাময়িক শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বিরচিত গদ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। রূপ গোস্বামী "কারিকা" নামে যে একখানি গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, আমরা তাহা পাইয়াছি ও যত্নে রক্ষা করিয়াছি; তদানীন্তন বাঙ্গালা গদ্যের আকার কি প্রকার ছিল প্রদর্শন করিবার জন্য, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম; পুস্তক খানির প্রারম্ভ বাক্য এই প্রকার; "শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ জয়। অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দ গুণ, গন্ধ গুণ, রূপ গুণ, রস গুণ, স্পর্শ গুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চ গুণ, শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে। শব্দগুণ কর্ণে.

গন্ধ গুণ নাসাতে, রূপ গুণ নেত্রে, রস গুণ অধরে. স্পর্শ গুণ অঙ্গে। এই পঞ্চ গুণে পূর্ব্ব রাগের উদয়—পূর্ব্ব রাগের মূল দুই; হটাৎ শ্রবণ, অকস্মাৎ শ্রবণ। ইত্যাদি।" সুতরাং যখন রূপ গোস্বামী প্রণীত গ্রন্থ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তখন যে বিদ্যাপতির গদ্য রচনা ছিল না ও তাহা বহুল অনুসন্ধানে সংগৃহীত হইবে না, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। তবে গদ্য রচনা প্রচলিত থাকিলেও তাহার বিশেষ প্রসর ছিল না এ কথা স্বীকার করিতে হইবে; এবং এই জন্যই তাহার পরবর্ত্তী সময়ের কোন গদ্য গ্রন্থই আমরা পাই না। এই সময়ে এই প্রথা কিঞ্চিৎ অবহেলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কবিকঙ্কণের সময়ের অনেক পূর্ব্বেই যে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে পক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই; কেন না কৃত্তিবাস পণ্ডিত কথায় কথায় তদীয় রামায়ণে কথকগণের উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্য সময়ে কথকগণই কেবল গদ্য রীতির উপাসক ছিলেন; তাঁহাদের সময় হইতেই গদ্য রচনার আলোচনা আর বন্ধ হয় নাই; তবে ব্রিটিষ রাজত্বের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত ইহাতে বিশেষ কিছুই বলাধান হয় নাই, একথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু গদ্য রচনার উৎপত্তি ব্রিটিষ রাজত্বের অনেক পূর্ব্বেই হইয়াছে; যাহা হউক আমরা এই স্থানে গদ্য রচনা ও কথকবৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন কালে উপনীত হইতেছি।

আমরা এইবার কবিকঙ্কণ সমাজে উপস্থিত হইলাম; কবিকঙ্কণ কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা এক প্রকার দেখান হইয়াছে; যে সময়ে প্রবল প্রতাপান্বিত আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন কবিকঙ্কণ সেই সময়ে বর্ত্ত-

মান ছিলেন ; তিনি আকবর সাহের প্রধান কর্ম্মচারী মহারাজ মানসিংহের কর্ত্তৃত্বকালে প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; কবিকঙ্কণের সময়ের পূর্ব্বেই বঙ্গদেশ স্বাধীন পাঠান রাজগণের অধীন ছিল ; তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে বঙ্গীয় প্রজাগণ কিরূপে নিগৃহীত হইত তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে ; তাঁহাদের শাসন কাল হইতেই সমাজে ঘোর নিশা আরম্ভ হইয়াছে—কবিকঙ্কণের সময়ে সমাজের অস্থি-মজ্জায় দুঃখের প্রবাহ প্রবেশ করিয়াছে—তখন সুখ আপনার সমুদায় সম্পত্তি লইয়া প্রজাগণের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে ; প্রজাগণ আপনা লইয়াই ব্যস্ত, দুঃখ-শোকে কাতর, মর্ম্ম পীড়ায় নিপীড়িত ; এমন মর্ম্ম-পীড়ায় কাতর হিন্দুসন্তানের আর উপায় কি ? হিন্দুসন্তান এমন দুঃসময়ে আর কাহার শরণ লইবে ? ক্ষমতা নাই—সাহস নাই ; কিরূপে বঙ্গবাসী এই দুস্তর দুঃখ সাগর হইতে পার হইতে পারেন ; এমন বিপৎকালে বঙ্গবাসীর চির-সেবিত দেবতা ভিন্ন আর কে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন ? সকল দেবতা নহেন ; যিনি এক সময়ে দুর্দ্দান্ত অসুর নিচয় বিনাশ করিয়া পৃথিবী পিশাচ শূন্য করিয়াছিলেন, তিনি ভিন্ন হিন্দু সন্তানের এ দুঃসময়ে আর উপায়ান্তর কি ? তিনি যদি এই হিন্দুরক্ত-লোলুপ অসুর প্রকৃতিক যবনগণকে বিনাশ করিয়া সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীগণকে রক্ষা না করেন, তবে আর কে তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন ? তাই সেই অসুর-ঘাতিনী—মহিষ-মর্দ্দিনীর অর্চ্চনা প্রয়োজন ; কবিকঙ্কণ যবন ভয়ে সাতপুরুষের প্রিয় বাস্তুভিট্টাটি বিনা বাক্যব্যয়ে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেও যবন ধ্বংশ কামনা তাঁহার পবিত্র

মানসক্ষেত্র হইতে দিনেকের জন্য অন্তর্হিত হয় নাই। অন্তরের এই নিভৃত কথা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই—কি জানি তাহা করিলে যদি কোন বিপদ ঘটে; কিন্তু এই চিন্তা তাঁহার যপ স্বরূপ ছিল; এই জন্যই কবিকঙ্কণ পলায়ন করিতেছেন, পথিমধ্যে পথশ্রান্ত ও চিন্তাক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন; এমন সময় তাঁহার প্রতি চণ্ডীর আদেশ হইল; চণ্ডী তাঁহাকে অভয় দিলেন এবং তাঁহার মঙ্গল গান—তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন বঙ্গের প্রতি লোকের হৃদয়ে উজ্জীবিত করিতে পারিলে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে এই উপদেশ দিলেন; কবিকঙ্কণের বাসনাপাবকশিখা দ্বিগুণতর উদ্দীপিত হইল—তাঁহার হৃদয় দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইল; তিনি সেই মুহূর্ত্ত হইতেই দেবী মাহাত্ম্যলীলা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার প্রশস্ত কল্পনারাজ্য আরও প্রসারিত হইল; তিনি নূতন প্রকারে নূতন গান ধরিলেন।

কবিকঙ্কণ আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার উদ্দেশেই কালকেতুর সৃষ্টি করিয়াছেন; কালকেতু অতি সামান্য লোক ও ব্যাধ বংশে তাঁহার জন্ম; কিন্তু দেবীর সামান্য মাত্র কৃপা-কণা লাভেই তিনি অসামান্য কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন; আবার তাঁহার মত নিরতিশয় দুঃখে নিপতিত হইলে, চণ্ডীর সামান্য অনুগ্রহ দৃষ্টিতে সমুদায় আপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, ইহা লোককে উপদেশ দিবার জন্যই শ্রীমন্তের অবতারণ; কবিকঙ্কণ, কালকেতু ও শ্রীমন্তের দ্বারা আপনার মনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই দুই জনের আদর্শ যাহাতে বঙ্গবাসী গ্রহণ করিয়া সকল আপদ হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার সাধন করিতে পারেন ও পরিশেষে

সুখের বিমল স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন সেই জন্য সচেষ্টিত হইয়াছেন। সকল লোকেই যাহাতে চণ্ডীর আরাধনা করেন—তাঁহার আরাধনার সকলে বলীয়ান হইয়া উঠেন এইটিই তাঁহার অন্তরের রম্য অভিলাষ। এই জন্যই তাঁহাকে চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য নূতন পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল—তিনি এই জন্যই কল্পিত উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াছিলেন। কালকেতু ও শ্রীমন্তের আখ্যায়িকা তাঁহার স্বকপোল কল্পিত; তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন কবিই কোন প্রকার আখ্যায়িকা রচনা করেন নাই; যদিও ক্ষেমানন্দ ও কেতকানন্দ দাস দুই জন একত্রে "মনসার ভাষাণ" নামক উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তত্রাপি তাহা তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া বোধ হয় না; বঙ্গদেশে সর্পভীতি পূর্ব্বকাল হইতেই প্রবল—সুতরাং সময়ে সময়ে মনসাদেবীর পূজার্চ্চনা হইত ও বেহুলা নখীন্দরের আখ্যায়িকা পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল; সেই গল্প অবলম্বন করিয়াই ক্ষেমানন্দ আপনার "মনসার ভাষাণ" রচনা করেন। যাহা হউক কবিকঙ্কণই স্বকপোল-কল্পিত আখ্যায়িকার জন্মদাতা; এক্ষণে যে বঙ্গদেশ উপন্যাসমালায় আচ্ছন্ন হইয়াছে—বঙ্গভাষায় কবিকঙ্কণই সেই উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা।

কবিকঙ্কণ বঙ্গভাষার প্রথম উপন্যাস লেখক; তাঁহার উপন্যাসে, চরিত্র চিত্রণে কোন দোষ স্পর্শ করে নাই; একের চরিত্রের ছায়া অপর চরিত্রে নাই; সকল চরিত্রই সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ও সুন্দর রঙ্গে চিত্রিত—তাঁহার মত সুচিত্রকর সহজে পাওয়া যায় না। তিনিই বঙ্গভাষার প্রথম প্রধান মহাকবি; তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল কাব্য রচিত হইয়াছিল তৎসমুদায়ই প্রায় গীতিকাব্য—সম্পূর্ণ নূতন মহাকাব্য আর ছিল না। তিনি

এই সময়ে বঙ্গভাষার কণ্ঠে যে মণিহার প্রদান করিলেন তাহার আর তুলনা নাই। কবিকঙ্কণ চিরজীবন দুঃখেই কাটাইয়াছিলেন—সুতরাং তিনি যেমন দারিদ্র্য জীবন চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন এমন আর কেহই নহেন, আবার সামান্য আহ্লাদের কথা নহে যে, পূর্ব্ব কবিগণের অশ্লীল আদিরস তাঁহার গ্রন্থকে স্পর্শও করিতে পারে নাই; কবিকঙ্কণ আদিরস বর্ণনা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে অশ্লীলতার লেশ মাত্রও নাই;) তিনি তাঁহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য—স্বদেশীয় লোককে বীরভাবে উদ্দীপিত করিবার জন্য, দেবী মাহাত্ম্য লিখিতেছেন সুতরাং তাহাতে অশ্লীলতা থাকিবে কেন? আবার তাঁহার রচনায় বিদেশীয় ভাব কিছুমাত্র প্রবেশ করে নাই—তাঁহার মত প্রতিভাশালী প্রকৃত বঙ্গীয় কবি বঙ্গদেশে আর দেখিতে পাই না; তিনি কি বাহ্য জগৎ বর্ণনায়—কি মানব স্বভাব পরিজ্ঞানে—কি করুণ রসের উদ্দীপনায় সকল বিষয়েই অদ্বিতীয়; তাঁহার সুকল্পনা শক্তির নিকট আর কেহই তিষ্ঠিতে পারেন না; তাঁহার কল্পনা বিচিত্রভাবভরা—তাঁহার প্রতিভা অতুলনীয়া; তিনি যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহারই স্বকপোল-কল্পিত। তিনি চণ্ডীকাব্যে যে সকল মনুষ্য চরিত্র আনিয়াছেন তাহা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন, আবার মনুষ্য চরিত্র ব্যতীত দেব চরিত্র সকলও অতি বিকচরূপে বিভাষিত করিয়াছেন; যাহা হউক সকল বিষয়েই তাঁহার তুলনা নাই; তবে তাঁহার ভাষা ভারতচন্দ্রের চাঁচাছোলা মসৃণ ভাষার ন্যায় সুমার্জ্জিত ও সুপরিষ্কৃত নহে; তাহাতে আর তাঁহার দোষ দেওয়া যায় না—তিনি যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, বঙ্গভাষার আকার তখন সেই প্রকারই ছিল; কৃত্তিবাসের

রচনাতেও আমরা ঠিক সেইরূপই ভাষা দেখি; আমরা এক্ষণে যে মুদ্রিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার নিজের ভাষা নহে; পণ্ডিতবর জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার কৃত্তিবাসের ভাষার এইরূপ বিকৃতি সাধন করিয়াছেন; তিনি কতিপয় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণের পরামর্শে কৃত্তিবাসের ভাষা সংশোধন করিয়া আধুনিক ভাষার মত করেন; যাহা হউক কবিকঙ্কণের ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজের ভাষা; তাহাতে ছন্দোবন্ধের তাদৃশ ঘটা নাই—ভাষার তত মনোহর ছটা নাই—তত্রাপি তাঁহার কাব্য বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের প্রদীপ্ত ভাস্কর স্বরূপ—সাহিত্যভাণ্ডার মধ্যস্থ মহামূল্য রত্ন নিচয় মধ্যে কহিনূর; শুধু বঙ্গীয়ভাব পূর্ণ এমন মহামূল্য অলঙ্কার বঙ্গীয় সাহিত্য আর কখন অঙ্গে দেন নাই।)

কবিকঙ্কণ যাহাতে স্বীয় রচনা সকলেরই চিত্তাকর্ষক হয় ও সকলেই যাহাতে উদ্দীপিত হন, এই জন্য তাহা চণ্ডীর আজ্ঞায় রচিত হইয়াছে বলিয়াছেন; তিনি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে লিখিয়াছেন—

করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া,
আজ্ঞাদিল রচিতে সঙ্গীত।

অন্য এক স্থলে,—

হাতে করি পত্র, মসি, আপনি কলমে বসি,
নানা ছাঁদে লিখান কবিত্ব।

এরূপ দেবী বাক্যের দোহাই দিবার অন্য কোন কারণই দেখা যায় না কেবল তিনি যাহা লিখিতেছেন তাহা সকলেরই আলোচ্য হইবে ইহার জন্য। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন কবিই স্বীয় গ্রন্থে এইরূপে দেবতার আজ্ঞা খ্যাপন করেন নাই; কিন্তু বঙ্গীয় কোন কবি তাঁহার পূর্ব্বে এরূপ না

করিলেও, অন্যদেশীয় কোন কোন কবি এইরূপে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য, এবম্বিধ কথা ঘোষণা করিয়াছেন দেখা যায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর আজ্ঞায় গ্রন্থ রচনা করিতেছেন মনে হইলেই ইংরাজী প্রথম কবি সিডমনের (Caedmon) কথা মনে পড়ে।) সিডমন এইরূপ লিখিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে কবি ছিলেন না কিম্বা কাব্যে তাঁহার আদর ছিল না; একদিন কোন স্থানে কতকগুলি ভদ্রলোক আমন্ত্রিত হইয়াছেন, সিডমনও তথায় উপস্থিত; সেই স্থলে সেই সময়ে সঙ্গীতের তরঙ্গ উঠিল; সিডমন তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন ও আসিয়া মনোদুঃখে অন্য এক নির্জ্জন স্থানে ঘুমাইয়া পড়িলেন; এমন সময়ে কবিতাদেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিতা, তিনি বলিলেন সিডমন ঘুমাইয়া কেন? একটী কবিতা রচনা ও তাহা গান কর; সিডমন উত্তর করিলেন আমি গান জানি না কি করিয়া রচনা করিব; দেবী বলিলেন আমার কৃপায় তুমি উত্তম কবি হইবে; সিডমন নিদ্রাভঙ্গে উঠিলেন; সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার মুখদিয়া অনর্গল কবিতা নিঃসৃত হইতে লাগিল; লোকে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া অবাক হইয়া পড়িল। সিডমন সেই দেবীর আজ্ঞাতেই ইংরাজী ভাষায় মহাকাব্য রচনা করিলেন *। তিনি নিজে এক জন ধর্ম্ম যাজক ছিলেন; এবং তিনি পৃথিবীর সৃষ্টি প্রকরণাদি আপন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন; যাহাতে তাঁহার রচনা সকলেরই হৃদয়াকর্ষক ও অভ্রান্ত বলিয়া সকলের মনে ধারণা হয় তাহা করিবার জন্যই তিনি এইরূপ

* J. R. Green's short History of the English people. Ch. I Sec. 3. Page 26.

দেবী আজ্ঞার কথা খ্যাপন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণও ঠিক সেই কারণ বশতঃই আপন গ্রন্থ দেবী আজ্ঞায় সংরচিত হইয়াছে বলিয়াছেন। চণ্ডীর পূজায় সকলে উদ্দীপ্ত হইয়া যাহাতে যবনগণকে দেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দেয় এইটিই তাঁহার হৃদয়ের মূল মন্ত্র—ইহাই তাঁহাব অন্তরের বাসনা; সেই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যই তিনি চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছেন,) সুতরাং তাহাতে দেবীর আজ্ঞার কথা না বলিবেন কেন? তাঁহার সময়ে যবন অত্যাচারে লোকে প্রপীড়িত—সমাজ দুঃখে পরিপূর্ণ; তখন আর লোকেব দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই, দুর্গতি রাখিতে স্থান নাই; সুতবাং দুর্গতি নাশিনী দুর্গা ভিন্ন তখন লোকের আর উপায়ান্তর কি? সেই দুর্গাই যাহাতে সকলেরই তপ, যপ, ধ্যান, জ্ঞান হয় তাহার বিধান করাই বিহিত। বাঙ্গালী বিপদে পড়িলে দেবানুগ্রহের প্রার্থী; দেবতার অনুগ্রহে সেই বিপদ্জাল হইতে নিষ্কৃতিলাভ কবিতে চাহে; সুতরাং মুসলমানগণের অত্যাচাব সময়ে হিন্দুমাত্রেই দেবানুগ্রহেব প্রার্থী ছিলেন; সেই দেবানুগ্রহপ্রার্থী সমাজের ফল মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল। লোকে সকল দেবতারই অনুগ্রহ প্রার্থী ছিলেন; কিন্তু মুকুন্দরাম সমাজের এই দুঃসময়ে চণ্ডীই সকলের শরণ্য এই কথা প্রচার করিলেন। সকল লোককে তিনি উপযুক্ত দেবীর প্রতি আকর্ষণ করিলেন। সকলের মন চণ্ডীর দিকে আকৃষ্ট হইল; সকলেরই হৃদয় চণ্ডী মাহাত্ম্যে নাচিয়া উঠিল। সমাজে বলাধান হইবার সূত্রপাত হইল।

দুঃখের অবস্থায় যুগপৎ ভবিষ্যতের আশা ও অতীত স্মৃতি লোকের মনকে উদ্বেলিত করে। কেহ কেহ ভবিষ্যৎ সুখ

কামনায় মুগ্ধ হইয়া কোন রূপে কষ্টে সৃষ্টে জীবনাতিবাহিত করেন, আবার কেহ বা অতীত সুখ স্মরণ করিয়া পরিতৃপ্ত রহেন; কবিকঙ্কণ প্রথম দলের নেতা—কৃত্তিবাস দ্বিতীয় দলের চূড়া। দুই জনই এক দুঃখের সমাজে বর্ত্তমান ছিলেন; এক-জন ভবিষ্যৎ কামনায় মুগ্ধ—অপর জন অতীত সুখ স্মরণেই পরিতৃপ্ত; একজন, যে চণ্ডী মাহাত্ম্য বীজ বপন করিলেন তাহার বলে চণ্ডীর প্রসাদে ভবিষ্যতে কালকেতুর ন্যায় কোন লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া, দেশে শান্তি স্থাপন করিতে পারে—লোকে শ্রীমন্তের ন্যায় নানা দুঃখে পতিত হইয়াও পরিশেষে ভগবতীর কৃপায় সকল প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার সাধন করিতে পারে—এই মনে করিয়া প্রশান্তচিত্ত; ও অন্যজন যে অতীত রামলীলা গান রূপ বীজ বপন করিলেন তাহার বলে লোকে সকল প্রকার দুঃখেই রামচন্দ্রের ন্যায় প্রশান্ত থাকিতে পারে,—সকল বিপদকেই উপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় অটল থাকিতে পারে এই ভাবিয়াই হৃষ্ট চিত্ত। একজন মর্ম্মা-ন্তিক পীড়ায় অত্যন্ত কাতর—অন্তর্দ্দাহে ভস্মীভূত—তাই প্রতি-হিংসা প্রবৃত্তি তাঁহার সাতিশয় প্রবল—তাই যবন বধ সাধন তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত এবং সেই জন্যই তিনি অসুরঘাতিনী সুরেশ্বরীর প্রিয় সেবক; অপর জনকে যবন অত্যাচারে বাস্তু ভিট্টা পরিত্যাগ করিতে হয় নাই অথচ তাহা হইতে বিশেষরূপে প্রপীড়িত; আবার তাহা হইতে পরিত্রাণের কোন উপায়ই নাই সুতরাং যে মহাপুরুষ অমিত তেজা হই-য়াও বিষম বিপদে ও দুঃখে জড়ীভূত হইয়াছিলেন, সেই প্রিয় রামচন্দ্রের সেই সকল অতীত দুঃখকাহিনীই তাঁহার সর্ব্বস্ব—তাই যখন সমাজস্থ সকলেই মর্ম্মপীড়ায় কাতর, তখন তিনি

রামচন্দ্রের দুঃখের সংগীত গাহিয়া সকলকে শান্ত করিতেছিলেন—তাই তিনি রামচন্দ্রকে সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাঁহারই প্রশান্ত মুখ দিয়া বলাইতেছিলেন "তোমরা কি কষ্ট পাইতেছ— আমার দুঃখের দিকে একবার চাহিয়া দেখ; আমার দুঃখের সহিত কি তোমাদের দুঃখের তুলনা হইতে পারে?" কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস দুই জনেই দুঃখের গীত গাহিয়াছেন; দুই জনেই বঙ্গের এক সমাজে এবং আমাদের বিবেচনায় একই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তবে দুই জন এক স্থানের কবি নহেন; একজন শান্তিপুরের নিকট বাসী ও অপর জন রায়নার নিকট বাসী হইয়াও মেদিনীপুর প্রবাসী; একজনের কবিত্ব নদীয়া জেলায় স্ফুরিত হয়—অন্য জনের মেদিনীপুর জেলায় নিঃসৃত হয়; সুতরাং দুই জনের পরস্পর পরিচয় হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। বিশেষ তখন সমাজে দুঃখের দশা—তখন সকলেই আপনার প্রাণ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত- এমন দুঃসময়ে কি প্রকারে এমন দূরস্থিত দুই জন কবিতে পরিচয় হইতে পারে? কবিকঙ্কণ প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসরে তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনা সমাপ্ত করেন; সেই পঞ্চবিংশতি বৎসরই তিনি মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামে রঘুনাথ রায়ের সভায় ছিলেন; তাহার পর কখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন কি না তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবে তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি রায়না থানার অধীন ছোট বৈনান গ্রামে বসবাস করিতেছেন বলিয়া তাঁহার প্রত্যাগমনের কতকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা হইলে ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না যে, তিনি ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দামুন্যা পরিত্যাগ করেন ও অন্ততঃ ৩০ বৎসর মেদিনীপুরে অবস্থান করেন, তাহার পর

যদি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন তখন তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর। তাহা হইলেই প্রত্যাগমনের সময় তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাহার পর এ অঞ্চলে তাঁহার প্রতিপত্তি স্থাপিত হয় সুতরাং জীবিতাবস্থায় শান্তিপুর অঞ্চলে তাঁহার প্রতিপত্তি লাভ করা অসম্ভব; সেই জন্যই কৃত্তিবাস তাঁহার কোন উল্লেখ করিতে পারেন নাই; আবার মুকুন্দরামও এদেশে থাকেন নাই সুতরাং এ দেশের কোন বিশেষ সমাচার রাখিতে পারেন নাই, কাজেই কৃত্তিবাসের কথা তিনি না শুনিয়া থাকিবেন; এই জন্যই কেহ কাহারও নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অনেকে বলিয়া থাকেন কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে কবিকঙ্কণ তাঁহার গ্রন্থের কোন না কোন স্থলে কৃত্তিবাস বা তদীয় রামায়ণের উল্লেখ করিতেন। তাহা নহে, কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস এক সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে যাঁহারা কৃত্তিবাসকে কবি কঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তির মধ্য হইতে আমাদের মতের পোষক প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় কি না এবং তাঁহাদের যুক্তি নিচয় অভ্রান্ত কি না, তাহাই দেখিতে হইতেছে।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাসস্থান শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রাম; তিনি এক স্থানে এই ফুলিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন; যথা;—

স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥ অরণ্য কাণ্ড।

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, তাঁহার বাসস্থান ফুলিয়া গ্রামে ছিল; কিন্তু তিনি রচনার সময় ফুলিয়ায় ছিলেন না; কেন না

তাহা হইলে "সেই ফুলিয়ায়" না লিখিয়া "এই ফুলিয়া" কিম্বা এই স্থানে অপর কোন শব্দ ব্যবহার করিতেন। যাহাই হউক, তিনি ফুলিয়া গ্রামকে সকল গ্রামের প্রধান বলিয়াছেন; তাঁহার এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য কি? জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরিয়সী বলিয়াই কি কৃত্তিবাস ফুলিয়ার এত প্রশংসা করিয়াছেন? না ইহার অপর কোন গূঢ় কারণ আছে? অনেকে বলিয়া থাকেন, দেবীবরের মেল বন্ধনে ফুলিয়া মেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরি গণিত হয়; এই মেল বন্ধনের পর কৃত্তিবাস তথায় জন্মগ্রহণ করেন সুতরাং তিনি তাহার এত প্রশংসা করিয়াছেন। একথা অসঙ্গত নহে; তবে দেখিতে হইতেছে দেবীবর কোন সময়ের লোক। দেবীবরের মেল বন্ধন কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে, গৌরাঙ্গ দেবের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিপ্লবই তাহার মূল বলিয়া আমরা জানিতে পারি; গৌরাঙ্গ প্রভু সর্ব্বসাধারণে ভক্তি মাহাত্ম্য শিক্ষা দিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূলে যে কুঠরাঘাত করিয়াছেন--লোকের মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে—জাতিভেদ সম্বন্ধে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছেন, দেবীবর আপন ধর্ম্মের পুনঃ প্রাধান্য ও জাতিভেদ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই মেল বন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন বলিয়াই বোধ হয়; তাঁহার এই মেল বন্ধনই বৈষ্ণব ধর্ম্ম হীন বীর্য্য হইবার এক প্রধান কারণ। যাহা হউক, ইহাতে এই অবগত হওয়া যাইতেছে যে, দেবীবর চৈতন্যদেবের অনেক পরবর্ত্তী লোক; চৈতন্যদেব ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন; তাহা হইলে দেবীবর এই সময়েরও অনেক পরে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র দেবীবরের সম-সাময়িক লোক ছিলেন (১)।

(১) বঙ্গদর্শন ৪র্থ খণ্ড ২০৩ পৃষ্ঠা দেখ।

নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের সম কালীন; তাহা হইলে তাঁহারও ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান থাকা সম্ভব; সুতরাং তাঁহার পুত্রের সময় ১৫৩৪+২৬ অর্থাৎ ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া আমরা নির্ণয় করিতে পারি: দেবীবর তাহা হইলে এই সময়েই মেল বন্ধন করেন ও এই মেল বন্ধনে ফুলিয়া মেল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। দেবীবরের এই কার্য্য বঙ্গদেশময় পরিব্যাপ্ত হইতে অন্তত বিংশতি বৎসর লাগিয়া ছিল; তাহার পর ফুলিয়া মেলের প্রাধান্য সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইলে কৃত্তিবাস সেই গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করিয়া আত্ম-গৌরব করিতে পারেন; ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, কৃত্তিবাস ১৫৬০+২০ অর্থাৎ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রামায়ণ রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

দ্বিতীয়তঃ। দেবীবর ঘটক যে সময়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের মেল বন্ধন করেন, তাহার কিছুদিন পরে সেই একই কারণ বশতঃ পুরন্দর বসু খাঁন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থগণের একযায়ী করেন। ইনি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সম-সাময়িক ছিলেন। পুরন্দর খাঁন ত্রয়োদশ পর্য্যায়স্থিত কায়স্থগণের একযায়ী করেন। এক্ষণে ২৪।২৫ পর্য্যায়েরই অধিক কায়স্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেই একযায়ীর সময় হইতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের ধারাবাহিক পুরুষ ধরিলে আমরা ১১।১২ পুরুষ প্রাপ্ত হই; সুতরাং ২৫ বৎসর করিয়া প্রতি পুরুষের গণনা ধরিলে ১২×২৫ অর্থাৎ ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে উপনীত হইতেছি। ১৮৮২ হইতে ৩০০ বৎসর অন্তর করিলে আমরা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ প্রাপ্ত হইতেছি; এই সময়েই পুরন্দর বসু খাঁন বর্ত্তমান ছিলেন ও কৃত্তিবাস এই সময়েই তাঁহার রামায়ণ রচনা করিতেছেন।

তৃতীয়তঃ। কৃত্তিবাস একস্থলে নবদ্বীপের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সপ্তদ্বীপের সার বলিয়াছেন যথা ;—

গঙ্গারে লইয়া যান প্রফুল্লিত হইয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া॥
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম॥

আদিকাণ্ড। সগর বংশ উদ্ধার।

কৃত্তিবাসের সময় নবদ্বীপ মহা তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে ; নবদ্বীপে কৃষ্ণচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই উহা প্রধান তীর্থ ও সেই জন্যই কৃত্তিবাস তাহাকে সপ্তদ্বীপের সার বলিয়াছেন। কৃত্তিবাসের সময় চৈতন্যদেব পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণ অবতার বলিয়া গণ্য হইবাছেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় ; না হইলে তিনি নবদ্বীপকে সপ্তদ্বীপের সার বলিবেন কেন ? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি চৈতন্যদেব গোবিন্দদাসের সমাজে অবতার বলিয়া অভিহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছেন ; কৃত্তিবাসের সময় তিনি পূর্ণ অবতার বলিয়া গণ্য ; তাহা হইলে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর অন্ততঃ ৪০। ৪৫ বৎসর গত না হইলে আর কখন এরূপ হয় নাই, সুতরাং আমরা কৃত্তিবাসের সময় চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের সময় ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ৪৫ বৎসর যোগ করিলে ১৫৭৯—৮০ এই সময় প্রাপ্ত হইতেছি ; কৃত্তিবাস এই সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন।

চতুর্থতঃ। অনেকে বলিয়া থাকেন “গীত গোবিন্দে” জয়দেব যে লঘু ত্রিপদী ছন্দের অবতারণা করেন, কৃত্তিবাসই প্রথমে সেই ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় আনয়ন করেন ; তৎপরে কবিকঙ্কণ প্রভৃতি অন্যান্য কবিগণ ইহা ব্যবহার করিয়াছেন

এই কথা বলিয়া তাঁহারা কৃত্তিবাসকে কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণ করেন। কিন্তু আমরা দেখাইব কৃত্তিবাস প্রথমে এই ছন্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার করেন নাই; তাঁহার অনেক পূর্ব্বে বৈষ্ণব কবিগণ তাহা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন; দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘুত্রিপদী উভয় প্রকার ছন্দই তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন; আমরা এই স্থলে অগ্রে তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলাম;—

আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি,
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি,
তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা, কনক কটোরা,
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন, জনু বুঝি ঐছন,
পাশ পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাঁতি, অধর মিলায়তি,
মৃদু মন্দ কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অন্তরে সে দুঃখ রহ,
হেরি হেরি না পূরল আশা॥

চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন;—

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারও কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।

বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমত যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী, খুলয়ে গাঁথনী,
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘ পানে,
কি কহে দুহাত তুলি ॥
এক দিঠ করি, ময়ুর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বঁধুর সনে ॥

আমরা উপরে যে দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ; বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বঙ্গভাষার আদি কবি; তাঁহাদের রচনাতেও ত্রিপদী ছন্দের অভাব নাই; আমরা এক্ষণে দেখাইব বৈষ্ণব কবিগণ দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করিতেও বিরত ছিল না; তাহা দেখাইবার জন্য আমরা গোবিন্দদাস হইতে একটী পদাংশ উদ্ধৃত করিলাম;—

তোমার বিলম্ব দেখি, বলরাম পথে থাকি,
পাঠাইল তোমা আনিবারে।
যাবে কিনা যাবে তথা, দঢ় করি কবে কথা,
বলরামের দোহাই তোমারে ॥
যদি বা এড়িয়ে যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই,
চিত নিবারিতে মোরা নারি।
কিবা গুণ জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান,
একতিল না দেখিলে মরি ॥

শুনিয়া শিশুর বাণী, হাসে দেব চূড়ামণি,
মুদিত নয়ান পরকাশে।
গোবিন্দদাসের পঁহু, হাসিয়া হাসিয়া রহুঁ,
চলিলেন বিহারের রসে॥

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই বঙ্গীয় প্রত্যেক প্রাচীন কবিই এই উভয় প্রকার ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন—ভাষা সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই উহা প্রচলিত আছে; উহা কৃত্তিবাস কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালাভাষায় আনীত হয় নাই। সুতরাং যাহারা বলেন কৃত্তিবাসই প্রথমে এই ছন্দ বাঙ্গালাভাষায় আনয়ন করেন ও তৎপরে মুকুন্দরাম ইহা গ্রহণ করেন, সুতরাং মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসের ৪০ বৎসর পরবর্ত্তী লোক; কেন না কোন একটী নূতন বিষয় সে কালে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে অন্ততঃ ৪০ বৎসর লাগিত; এই যুক্তির কোন মূল নাই (১)। কাজেই এই ভ্রম পূর্ণ যুক্তিবলে কবিকঙ্কণ কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। প্রত্যুত উভয়ের রচনাগত সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে তাঁহাদিগকে সমকালীন লোক বলিয়াই দৃঢ়রূপে ধারণা হয়।

এক্ষণে দেখিতে হইতেছে কবিকঙ্কণ কোন সময়ের লোক; তিনি তাঁহার কাব্যের একস্থলে লিখিয়াছেন;—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কবিকঙ্কণ ১৪৯৯ শকাব্দীয় বা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি

(১) বঙ্গ দর্শন, ৪র্থ খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠা।

কৃত্তিবাস ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন; তাহা হইলে ইঁহারা সম-সাময়িকই হইতেছেন; সুতরাং কৃত্তিবাসকে কবি-কঙ্কণ অপেক্ষা ৪০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিবার কোন কারণই দেখিতে পাইতেছি না। তবে এই স্থানে আর একটী তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে, কবিকঙ্কণ গ্রন্থোৎপত্তি বিবরণে লিখিয়াছেন যে, অম্বররাজ মানসিংহের শাসন কালে, ডিহিদার মামুদ-সরিফের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করেন; তাহার পর তাঁহার চণ্ডী রচিত হয়। মহারাজ মান-সিংহ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ পাইয়া এদেশে আগমন করেন, সুতরাং ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে চণ্ডী রচনার কাল ধরিলে উহা মানসিংহের বঙ্গদেশ আগমনের দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়; তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কবিকঙ্কণ গ্রন্থখানি পঞ্চবিংশতি বৎসরে সমাপ্ত করেন; শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন "তিনি (কবিকঙ্কণ) ১৪৯৫ শকে (১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে) চণ্ডীকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া, ১৫২৫ শকে (১৬০৩ খৃষ্টাব্দে) তাহা শেষ করেন (২)।" কিন্তু আমরা উপরে চণ্ডীকাব্য হইতে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে ১৪৯৯ শকে বা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনার কাল বলিয়া জানা যায়; এবং এইটিই অধিক প্রামাণ্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু ইহা গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নহে—ইহার প্রারম্ভ কাল। কবিকঙ্কণ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া ২৫। ২৬ বৎসরে উহা সমাপ্ত

---

(২) বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। ১০ পৃষ্ঠা।

করেন, তাহা হইলে মহারাজ মানসিংহের সময় তাঁহার গ্রন্থ রচনার সময়ের মধ্যে পড়িতেছে; সুতরাং গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার নামোল্লেখ করা অসম্ভব নহে। মানসিংহ এদেশে আগমন করিবার পূর্ব্বে মহারাজ তোড়রমল্ল মুনিমর্থার সহিত একযোগে বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন; কিন্তু পাঠানগণ কিছু দিনের মধ্যেই ইহা পুনরধিকার করিয়া বসেন; এইরূপে সপ্তদশ বৎসর ধরিয়া বঙ্গরাজ্যের জন্য মোগল পাঠানে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, পরিশেষে বিজয়লক্ষ্মী সম্পূর্ণরূপে মোগলের অঙ্কবর্ত্তিনী হইয়াছিল। এই সপ্তদশ বৎসর মোগল পাঠানের যুদ্ধে প্রজা পুঞ্জ যে অতিমাত্র নিগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই; সেই অতি নিগ্রহের সূত্রপাত হইতেই চণ্ডীকাব্যের সূত্রপাত। তৎপরে মানসিংহের কর্ত্তৃত্বকালে কবিকঙ্কণকে স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিতে হয়; তাই তিনি সকল লোককে চণ্ডীর মাহাত্ম্যে মুগ্ধ করিবার জন্য এই গ্রন্থ চণ্ডীর আদেশ ক্রমে আলিখিত হইল, ইহা সকলকে জানান প্রয়োজনীয় বিবেচনা করতঃ পরে "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণটি" ইহাতে সংযোজন করিয়া দিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কণের বংশধরগণ এক্ষণে ছোট বৈনান গ্রামে ও তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান দামুন্যায় বাস করিতেছেন। কবিকঙ্কণের পর হইতে তাঁহাদের ১১। ১২ পুরুষ হইয়াছে; তাহা হইলে আমরা কবিকঙ্কণকে ১২ × ২৫ অর্থাৎ ৩০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া জানিতে পারি; সুতরাং তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন ও সেই সময়েই তাঁহার গ্রন্থরচনা করিতেছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারি। তৎপরে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ মানসিংহ এদেশে আইসেন; তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে

মোগলের অধীন হয়। কিন্তু তাঁহার শাসন কালের শেষ সময়ে কবিকঙ্কণ এদেশে ছিলেন না—তাঁহার রাজ্যারম্ভের সময়েই মামুদসরিফের অত্যাচারে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি কৃত্তিবাস ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন; এবং তাহাই তাঁহার রামায়ণ রচনা আরম্ভ করিবার কাল। তাহার পর তাঁহাকে আর ছয়টী কাণ্ড রচনা করিতে হইয়াছিল; আবার রচনার সময় তাঁহাকে কথকগণের নিকট হইতে লিখিতব্য বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল, সুতরাং সমগ্র গ্রন্থখানি রচনা করিতে যে তাঁহার ২০ বৎসর লাগিয়াছিল তাহাতে আর সংশয় নাই। তাহা হইলেই কৃত্তিবাস ১৫৮০+২০ এই ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রামায়ণ শেষ করেন; প্রায় এই সময়েই অর্থাৎ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে কবিকঙ্কণের চণ্ডী রচনা সমাপ্ত হয়। তাহা হইলে কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস সম-সাময়িকই হইতেছেন।

কৃত্তিবাস অনুবাদক, কবিকঙ্কণ স্বকপোল-কল্পিত আখ্যায়িকা লেখক; আবার শুধু তাই নহে, তাঁহার পূর্ব্বে অপর কোন কবিই কখন আখ্যায়িকা রচনা করেন নাই। কবিকঙ্কণের রচনা অতীব মধুর ও প্রীতিপ্রদ; কেবল বঙ্গীয় ভাবসম্পন্ন এমন সুন্দর মহাকাব্য আর দ্বিতীয় নাই। কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস উভয়েই শ্রেষ্ঠ কবি; কিন্তু দুই জনে বিভিন্ন পথাবলম্বী হইবার জন্য, তাঁহাদের ক্ষমতার কিছু তারতম্য হইয়া পড়িয়াছে। উভয়েই অতিশ্রেষ্ঠ কবি, এবং উভয়েই পরবর্ত্তী সমুদায় বঙ্গীয় কবিরই আদর্শস্থানীয়; কবিকঙ্কণের আদর্শে ভারতচন্দ্র, রামেশ্বর, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি এবং কৃত্তিবাসের আদর্শে কাশীরাম, রঘুনন্দন, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ; আবার

এমন কবি অনেক আছেন, যাঁহাদের এই দুই কবিশ্রেষ্ঠই আদর্শ-স্থানীয়: যথা ঘনরাম—রূপরাম প্রভৃতি। যাহা হউক কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাসের বার্দ্ধক্য সময়ে যেমন দেশ হইতে নানা অত্যাচার দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছে—রাজা তোড়বমল্লের যত্নে রাজস্বের হিসাব ও বন্দোবস্ত হইয়াছে—প্রজাগণ অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ ও শান্তিলাভ করিয়াছে, সেইরূপ বঙ্গীয় সাহিত্যও নবীনভাবে সমুদিত হইয়া নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছে; তাহার ফল স্বরূপ কবিকঙ্কণের চণ্ডী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ: যেমন দুইটি কাব্যই দুঃখের সময় রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ দুইটিই ভবিষ্যৎ সুখের আভাস পাইয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

চণ্ডীকাব্যখানি কবিকঙ্কণের সম্পূর্ণরূপে স্বকপোল-কল্পিত; তিনি ইহাতে যে সকল পাত্র প্রবেশ করাইয়াছেন, তৎসকলই নূতন; ও তৎসকলেরই চরিত্রে সুন্দর বৈচিত্র সুরক্ষিত হইয়াছে এবং সমুদায় গুলিই সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের অন্তর বা বাহ্য জগদ্বর্ণনা নৈপুণ্য অতি সুন্দর—মানব স্বভাব পরিজ্ঞানে তিনি যেরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অদ্ভুত, আবার তিনি যে সকল দেব চরিত্র ইহাতে প্রবেশ করাইয়াছেন, সেগুলি সেইরূপ অলৌকিক ও বিকচরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন।) যদি তাঁহার বাহ্য জগদ্বর্ণনার সুন্দর উদাহরণ দেখিতে চান, তবে পথিমধ্যে ঝঞ্ঝাবাত বিতাড়িত কলিঙ্গ ও নগরাদিকে দৃষ্টিপাত করুন; যদি তাঁহার সুন্দর কল্পনা শক্তির পরিচয় চাহেন, তবে অকূল কালীদহে কমল কাননে কমলাসনা কামিনীর গজগ্রাস ও উদ্গীরণ ব্যাপার কিম্বা সিংহলেশ্বর পশুরাজ সিংহের সভাবর্ণন পাঠ করুন; যদি তাঁহার করুণ রসের অবতারণা দেখিতে

ইচ্ছা হয়, তবে ধনপতির কারামোচন স্থানে উপনীত হউন ; যদি দেবতার অলৌকিক ঘটনা দেখিতে চাহেন, তবে মশানে চণ্ডী-কার জরতী বেশে অবতরণ ও যোগিনী, প্রেতিনীগণের নৃত্যাদি অবলোকন করুন ; আর যদি এই সকলের একত্রে সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে দুঃখিনী ফুল্লরার নিকট গমন করুন। এইরূপে আমরা চণ্ডীর যে স্থানে পাঠ করিয়াছি সেই স্থানেই তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া প্রীত হইয়াছি ; তাঁহার তুল্য কবি বাঙ্গালাভাষায় আর নাই, আবার সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে যে, তিনি প্রাচীন কবি হইলেও তাঁহার আদিরস বর্ণনে কিছুমাত্র অশ্লীলতা নাই ; আমরা পূর্ব্বে দেখা-ইয়াছি তিনি দুঃখের অবস্থায় চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া লোকের চিত্ত তন্ময় করিবার জন্যই চণ্ডীকাব্য রচনা করেন, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে অশ্লীলতা থাকিবে কেন ? অশ্লীলতা থাকিলে পাছে তাঁহার গ্রন্থ দুষ্ট হয় এই জন্যই তিনি যত্ন করিয়া তাহা পরিহার করিয়াছেন। যাহা হউক, কবিকঙ্কণ অবিসম্বাদে বঙ্গ কবিরাজ্যে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন পাইবার অধিকারী।

কৃত্তিবাসও সামান্য কবি ছিলেন না ; তবে তাঁহার ক্ষমতা বিভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়া কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া পড়ি-য়াছে। কোন গ্রন্থের অনুবাদ করিতে গেলে কবির পূর্ণশক্তি তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে বিকাশ পায় না ; তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা যেন কোন অলক্ষিত বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ থাকে ; কবি তখন স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারেন না—তাঁহার কল্পনা শক্তির তত প্রসারণ থাকে না—কল্পনা তখন সঙ্কুচিতভাবে সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া গমন করিতে থাকে ; কবির অমানুষিক শক্তি তখন প্রায় অবরুদ্ধ ; সুতরাং সেই অবরুদ্ধ শক্তির সহিত কোন

স্বাধীন শক্তির তুলনা হইতে পারে না; এবং এই জন্যই কবি-কঙ্কণের সহিত কৃত্তিবাসের তুলনা করিতে যাওয়া অন্যায়। কিন্তু কৃত্তিবাস অনুবাদক হইলেও বাল্মিকীর অবিকল অনুবাদ করেন নাই; ইহাতে তিনি বাল্মিকীর অনেক ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিলেও স্থানে স্থানে নিজের কল্পনাও প্রবেশ করাইয়াছেন; এমন কি স্থানে স্থানে তাঁহার রামায়ণ, বাল্মিকী রামায়ণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি আদি কবি হইতে তাঁহার কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমুদায় কল্পনাতেই প্রায় তিনি নিজের বুকনি মিশাইয়াছেন এবং সেই রূপ করিয়া তাঁহার কাব্য বঙ্গবাসীমাত্রেরই আদরের ধন করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের নিজের কল্পনাও যে, বেশ হৃদয় গ্রাহিণী ও মনোহারিণী তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই এবং তাহার প্রসারণও যে অত্যধিক তাহাতেও সংশয় নাই। রামায়ণের স্থানে স্থানে তাঁহার এইরূপ সুকল্পনা শক্তির প্রাচুর্য্য দর্শনে ও তাহাদের মনোহারিত্ব সন্দর্শনে তাঁহাকে কোন ক্রমেই কবি-কঙ্কণের নিম্ন স্থানীয় বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার "রামের বন গমনে দশরথের বিলাপ," "সীতাহরণে রামের খেদ," "অশোক কাননে কনকলতা সীতার অবস্থা বর্ণন" প্রভৃতি বিষয়গুলি পাঠ করিলে তাঁহাকে অতি প্রধান কবি না বলিয়া থাকা যায় না। বাস্তবিকই কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস উভয়েই শ্রেষ্ঠ কবি, উভয়েই সমান। কিন্তু বঙ্গদেশে রামায়ণ ও কাশী-রামের মহাভারত যেরূপ উপকার সাধন করিয়াছেন এমন আর কোন গ্রন্থই নহে; চণ্ডী প্রভৃতি কাব্য কবিত্বে কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেও রামায়ণেরন্যায় কেহই সমাজের উপকারী হয় নাই। যদিও কৃত্তিবাস আদিকবির সারল্য রক্ষা করিতে পারেন

নাই—যদিও রাম-চরিত্র কৃত্তিবাস হস্তে রূপান্তরিত হইয়াছে, তত্রাপি তাহা যে সমাজে মহা উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। ভগবান্ বাল্মিকী যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার সহিত কৃত্তিবাসের সময়ের তুলনায় নাম পর্য্যন্তও মুখে আনিতে পারা যায় না; তবে বাল্মিকীর রাম-চরিত্র, কৃত্তিবাস কিরূপে চিত্রিতে সমর্থ হইবেন? তবে যে তিনি তাহাতে অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন—ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট শ্লাঘার বিষয়—তিনি যে বাল্মিকীর চরিত্র অনেকটা সুরঞ্জিত রাখিয়াছেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।) বাল্মিকীর কল্পনা রাজ্য যে অদ্ভুত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা যে কোন ভাষায়, যে রূপেই অনুবাদিত হউক না, সকলেরই মনোমুগ্ধকর হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তবে কৃত্তিবাস সেই চরিত্র অনেকটা ঠিক রাখিতে পারিয়াছেন ইহাই তাঁহার গৌরবের বিষয়। সুতরাং তাঁহার রামলীলা গান যে দুঃখ সহিষ্ণু—প্রেমপূর্ণ বঙ্গবাসীর অতি আদরের ধন হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কৃত্তিবাস সেই সময়ে রাম গান যদি না গাহিতেন, তাহা হইলে রামলীলা এতদিনে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে কেলী করিত কি না কে বলিতে পারে? কৃত্তিবাসই রাম-চরিত্র ভদ্র হইতে ইতর, জমিদার হইতে দোকানদার পর্য্যন্ত সকলেরই সম্মুখে ধরিয়াছেন—সকলকেই সমান ভাবে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার রামায়ণই বঙ্গদেশে ধর্ম্মভাব উজ্জীবিত রাখিয়াছে;) এখন যে ধনকুবের হইতে কপর্দ্দক বিহীন পর্য্যন্ত প্রতি বঙ্গবাসীরই কণ্ঠে রামচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন, তাহার একমাত্র কারণ কৃত্তিবাসের রামায়ণ। রামায়ণ ও মহাভারত বঙ্গদেশে যে কার্য্য সংসাধন করিয়াছে, এমন আর কোন দেশে কোন গ্রন্থই করে নাই। ইয়ু-

য়োপে যে কার্য্য বাইবেল ও ধর্ম্ম-প্রচারকগণ, সম্বাদ পত্র ও পুস্তকাগার দ্বারা সম্পাদিত হয়, বঙ্গদেশে তাহা কেবল রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারাই সংশাধিত হয়। বাইবেল ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের উপর সমান আধিপত্য করিতে পারে না; কিন্তু বঙ্গদেশে রামায়ণ ও মহাভারত প্রগাঢ় পণ্ডিত হইতে বর্ণজ্ঞান শূন্য ইতর লোক পর্য্যন্ত সকলেরই হৃদয় সুশীতল করে।) বঙ্গদেশের সামান্য ইতর লোকেরও, রামচন্দ্রের পিতৃ-সত্য-পালনার্থ অসামান্য স্বার্থত্যাগ, লক্ষ্মণের অসাধারণ ভ্রাতৃস্নেহ, জনক-দুহিতার অতুলনীয়া পাতিব্রত্য, দশাননের পাপ-জনিত সমুচিত প্রায়শ্চিত্য প্রভৃতি রামায়ণের বিষয়গুলি সুন্দররূপে জানা আছে; এবং এই জন্যই সকলেরই হৃদয়-কন্দরে প্রকৃত ধর্ম্মভাব নিমজ্জিত আছে। আবার এই কারণ বশতঃই বঙ্গের অতি ইতর লোকও ধর্ম্মজ্ঞানে ইয়ুরোপীয় ইতর লোক অপেক্ষা গরীয়ান্। যে রামায়ণ বঙ্গদেশে এমন মহান্ উপকার সংসাধন করিয়াছে, তাহা যে অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য তাহা কে অস্বীকার করিতে সমর্থ হইবেন? সুতরাং যে সমাজে এমন সুন্দর গ্রন্থ সংরচিত হইয়াছে, সেই সময় যে বঙ্গভাষার পক্ষে মহা কল্যাণকর তাহাই বা না বলিব কেন? কবিকঙ্কণের চণ্ডী শ্রেষ্ঠ কাব্য হইলেও, কৃত্তিবাসের রামায়ণ সকলের আদরের সামগ্রী। দুঃখের সময় সান্ত্বনা প্রদান করিতে, রামায়ণ যেমন সমর্থ চণ্ডী সেরূপ নহে। রামায়ণ রচনায় কবির যাহা সঙ্কল্প তাহা সিদ্ধ হইয়াছে; চণ্ডী রচনার উদ্দেশ্য সম্যক সিদ্ধ হয় নাই, কখন হইবে কি না সন্দেহ।

কবিকঙ্কণের পর কাশীরাম দাসের কাল। এ সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় নানাবিধ কাব্য সংরচিত হইয়াছে—এই

সময়ে কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাসের আদর্শে অনেক কবি সাহিত্য ক্ষেত্রে দর্শন দিয়াছেন।) কাশীরাম প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন; তিনি আনুমানিক ১৬০০ শকাব্দায় বা ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মহাভারত অনুবাদ করেন। ✓সংস্কৃত মহাভারতের তুল্য সুবৃহৎ মহাকাব্য জগতের অন্য কোন জাতীয় কোন সাহিত্যেই বিদ্যমান নাই; বাল্মিকীর রামায়ণ, বা হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি, বর্জ্জিলের ইনিয়াড বা মিল্ট-নের প্যারাডাইজ লষ্ট ও রিগেন, সেক্ষপীরের নাটক নিচয় বা ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসাবলী কেহই বেদব্যাসের মহাভারতের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। সকলেই ইহা হইতে ক্ষুদ্রতম; এমন কি রামায়ণ ব্যতীত অন্য সমুদায় গুলি একত্রিত করিলেও উহার সমান হয় কি না সন্দেহ। মহা-ভারতের এক একটি পর্ব্ব এক একটি বৃহৎ মহাকাব্য। কাশী-রাম সেই বৃহৎ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন; আবার কেবল অনুবাদ নহে, তিনি সেই অদ্ভুত গ্রন্থের সমুদায় রস ও ভাবই অক্ষুণ্ণ ও তাহার চমৎকারিত্ব অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। ইংরাজী কবি কাউপার (Cowper) প্রধান কবি হইয়াও ইলিয়াড অনুবাদে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; কিন্তু কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদে বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন, সুতরাং কবিসমাজে তাঁহার স্থান নিতান্ত নিম্ন নহে তিনি উর্দ্ধ স্থান লাভ করিবার অধিকারী। কাশীদাস মহাভারত অনুবাদে বেদব্যাসের প্রায় সমুদায় চিত্রই রক্ষা করিয়াছেন, তাহার উপর নিজের কল্পিত দুই একটি নূতন উপাখ্যানও সংযোজিত করিয়াছেন—সেগুলিও বেশ প্রীতিকর হইয়াছে।)

অনেকে বলেন সংস্কৃত মহাভারত কেবল বেদব্যাসের প্রণীত নহে; ইহা নানা ঋষি কর্ত্তৃক নানা সময়ে রচিত হইয়াছে। তবে বেদব্যাস ইহার প্রথম ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া যান; তৎপরে অন্যান্য ঋষিগণ কেহ বা একটি অধ্যায়, কেহ বা একটি উপাখ্যান যোগ করিয়া গ্রন্থের কলেবর এতাধিক বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহার বিচার করিতে পারি না; তবে মহাভারতের তুল্য বৃহৎ গ্রন্থ যে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতীয়সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নিশ্চয়; কাশীরাম দাস একাকী সেই বৃহৎ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে। কিন্তু ইহার প্রতিবাদ স্থলে অনেকে বলেন, কাশীরাম সমুদায় গ্রন্থখানি অনুবাদ করেন নাই; তিনি আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব্বের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া পরলোক গমন করেন; তৎপরে তাঁহার জামাতা নন্দরাম ঘোষ ইহা সমাপ্ত করেন। কিন্তু মহাভারতের শেষ পর্য্যন্ত প্রতি কবিতারই শেষ ভাগে কাশীরাম দাসেরই ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়; নন্দরামের নাম কুত্রাপিও দেখা যায় না। যদি ইনি মহাভারতের প্রায় পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ ভাগ অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম কোন না কোন স্থানে সন্নিবেশিত থাকিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহার নাম দেখি নাই; আবার মহাভারতের প্রথম তিন পর্ব্বের অনুবাদের সহিত, অন্যান্য পর্ব্বের অনুবাদে কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। ইহার সর্ব্বস্থলই সমান লালিত্যময়ী ও সমান তেজস্বিনী; কবিকঙ্কণ বা কৃত্তিবাসের রচনা অপেক্ষা ইহার রচনা সর্ব্বস্থলেই পরিশোধিত, মার্জ্জিত ও পরিপাটী

সুতরাং ইহা দুই জনের রচনা বলিয়া প্রভেদ করিবার কোন উপায়ই নাই ; ইহা যেন একজনেরই লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ; এবং বাস্তবিক তাহাই। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাই সঙ্গত। তিনি বলেন, কাশীরাম আদি, সভা, বন ও বিরাটের কতকদূর পর্য্যন্ত লিখিয়া কাশীধাম গমন করেন। মহাভারতে লেখা আছে যে—

আদি, সভা, বন, বিরাটের কত দূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥

আমাদের মতে এই স্বর্গপুরের অর্থ পরলোক নহে, ইহার অর্থ কাশীধাম। হিন্দু-শাস্ত্রমতে পিণাকীর ত্রিশূলোপরি সংস্থাপিত কাশীধাম স্বর্গ সদৃশ। সুতরাং কাশীরাম এই পর্য্যন্ত রচনা করিয়া কাশীধাম গমন করেন ইহাই যথার্থ। যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কবিকঙ্কণের সময়ে বাঙ্গালা ভাষা কিছু অপরিষ্কৃত ছিল; সে সময়ে যে সকল গ্রন্থ সংরচিত হইয়াছে তৎসমুদায়েরই ভাষা কেমন আবর্জ্জনা পূর্ণ—তখন ভাষা যেন মলিন ধূলিময়বসনে আবৃতা ; কাশীরামের সময়ে তাহার বসন পরিষ্কৃত হইয়াছে—যে আবর্জ্জনা রাশি তাহার চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান ছিল, তাহা অপসারিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে হইলে আর কোন কষ্টই হয় না। আমরা এই সময়ের যে কোন গ্রন্থই দেখি না, তাহাতেই এই প্রকার মসৃণ ভাষা দেখিতে পাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাসের আদর্শে অনেক কবি উত্থিত হইয়াছেন; এই সময়ে সেই আদর্শের ফল প্রথম বিকসিত হয়। কাশীরাম, কৃত্তি-

বাসের আদর্শে তাঁহার সুবৃহৎ মহাভারত এবং ঘনরাম ও রূপরাম কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস উভয়েরই আদর্শে তাঁহাদের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই সময়েই তাঁহার শিবায়ন প্রণয়ন করেন। এই সমুদায় গ্রন্থেরই রচনা বেশ মস্থণ, তবে রামেশ্বরের লেখা কিছু গ্রাম্য দোষে দুষ্ট।)

কাশীরামের সময়ে অত্যাচারী আরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; হিন্দুগণের প্রতি তাঁহার কিরূপ বিদ্বেষভাব ছিল, তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই বিশেষ অবগত আছেন; হিন্দুর উপর জিজিয়া নামক মস্তক কর পূর্ব্বে প্রচলিত থাকিলেও বাদসাহ কুল-তিলক আকবর সাহ তাহা উঠাইয়া দেন; আরঙ্গজেবের সময় তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহার সময়ে হিন্দুর দেব-দেবী ও দেবালয় সকল ভগ্নীকৃত ও তাহার উপর মসজিদ সংস্থাপিত হয়। এইরূপে আরঙ্গজেবের সময় হিন্দুগণকে নানারূপে নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়; তাঁহার এই অতি নিপীড়নের ফল শিবজীর উত্থান। ঈশ্বর কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে যথেচ্ছায় অত্যাচার করিতে দেন না; কেহ ভয়ানক রূপে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিলে ঈশ্বর তাঁহার উপযুক্ত দমন প্রেরণ করেন; সৃষ্টির প্রাক্কালাবধি এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে; তাই আরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দমন স্বরূপ শিবজীর উৎপত্তি। যদি এই সময়ে শিবজী না জন্মিতেন তাহা হইলে আরঙ্গজেবের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি কিরূপে পরিণত হইত কে বলিতে পারে; সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আরঙ্গজেবের দুষ্প্রবৃত্তি দমনে রাখিবার জন্যই শিবজীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; শিবজী অতি দর্পের সহিত সম্রাটের প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময়ে বঙ্গ-

দেশে কোন শিবজী জন্মগ্রহণ করেন নাই; সুতরাং বঙ্গদেশ আরঙ্গজেবের সম্পূর্ণ আয়ত্তের অধীন—তিনি তখন এখানে যাহা কিছু মনে করিয়াছেন, তাহাই অবাধে সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা সা-সুজা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিভেদে বঙ্গদেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি তাঁহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন—তাঁহাকে আরাকানে দুর্ব্বৃত্ত নর-পিশাচ হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। বঙ্গদেশে আরঙ্গজেবের আর কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না, সুতরাং তখন নিরাশ্রয়া বঙ্গভুমি দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজেবের পৈশাচিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করণের স্থল স্বরূপ হইল—সুতরাং বঙ্গবাসীগণ এই দুঃসময়ে যে কি প্রকারে নিগৃহীত হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই দুঃসময়ের কবি কাশীরাম, ঘনরাম, রূপরাম, রামেশ্বর। ইঁহারা সকলেই শিবজীর কথা শুনিয়াছিলেন—তাঁহার জন্য পিশাচ আরঙ্গজেব, দক্ষিণাঞ্চলে আপনার পৈশাচিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিতেছেন না, তাহাও অবগত হইয়াছিলেন; কিন্তু অন্য কোন উপায় নাই; এদিকে কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন—লোকের হৃদয়-কন্দরে বীরত্ব বীজ রোপন করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের মোহন সঙ্গীতে অনেকের হৃদয় উজ্জীবিত হইয়াছে; সেই হৃদয় আরও ঊর্দ্ধে তুলিবার জন্য মহাভারতের সৃষ্টি। কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদ করিয়া, রামচন্দ্রের ন্যায় দয়ার অবতারকে লোকের সম্মুখে ধরিয়া উপদেশ দিলেন যে, রামচন্দ্রের ন্যায় কষ্ট সহিষ্ণু হও—তাঁহার ন্যায় ক্ষমাগুণের আধার হও—তোমাকে যিনি নানারূপে নিপীড়িত করিলেন তাহার প্রতি সদয় হও—বিনা বাক্য ব্যয়ে

তোমার মুখের গ্রাস অপরের পাতে তুলিয়া দাও—রাজ্য-ধন, মানৈশ্বর্য্য—সুখ-সম্পদ সমুদায়ই অপহারককে দিয়া তাহাকে সর্ব্ব প্রকারে সুখী কর; পরিশেষে তোমার ভাল হইবে—এক্ষণে অত্যাচার সহ্য কর, পরিশেষে রামচন্দ্রের ন্যায় তোমার মঙ্গল হইবে—তুমি আবার রাজ্য-ধন, দাস-দাসী, সুখ-সম্পদ সমুদায়ই পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে; অতএব রামচন্দ্রের ক্ষমাগুণ শিক্ষা কর; ভরত তোমার রাজ্য কাড়িয়া লইলেও তাহার প্রতি অনুরক্ত হও; পরিশেষে ভরতের ন্যায় তোমাদের সেই পীড়ন কারীও তোমাদের অনুগত হইয়া, তোমাদের মস্তকে রাজচ্ছত্র ধরিবে। কৃত্তিবাসের এই উপদেশ প্রদানের পর অনেক দিন অতিবাহিত হইল, কিন্তু তাহা হইল কই? এক্ষণে ভরতের তুল্য লোক রাজ্যেশ্বর নহে; সেই জন্য তুমি যতই সহ্য করিবে তোমার উপর ততই অত্যাচার হইতে থাকিবে—তুমি ততই নানারূপে নিপীড়িত হইবে, সুতরাং ক্ষমা করিয়া বসিয়া থাকার কাল আর নাই; তাই কাশীরাম লোকের নিকট মহাভারত ধরিলেন; তিনি ইহা দ্বারা উপদেশ দিলেন যে, তোমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইলে আর ক্ষমা করিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে; তাহা হইলে তোমাদের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তৎ সকলও তোমাদের হস্ত হইতে স্খলিত হইবে; এখনও সময় আছে—এখনও আপনাদের স্বত্ব বজায় রাখিতে যত্নবান হও; কতকটা রাখিতে পারিবে। এক্ষণে তোমাদের স্বত্ব রক্ষা করিতে গেলে নানা প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইবে; তাহাতে ভয় করিও না; যদিও তোমাদের কোন প্রবল সহায় নাই, কিন্তু তোমরা বিবাদ আরম্ভ কর—তোমাদের সহায়ের অসদ্ভাব হইবে না; পরিশেষে তোমরা হৃতসম্পত্তি সমুদায়

পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে। এই দেখ পাণ্ডবগণ বনে বনে বনচরের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাঁহাদের তখন কেহই সহায় ছিলেন না; তাঁহারা আসিয়া আপনাদের স্বত্ব চাহিলেন; রাজা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না—তাঁহাদিগকে সম্মুখ হইতে তাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহাতে ভীত হইয়া আর পলায়ন করিলেন না—তাঁহারা আপনাদের স্বত্ব রক্ষার জন্য রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন; এই দেখ প্রথমে তাঁহাদের কেহই সহায় ছিলেন না; ক্রমে তাঁহাদের কত অক্ষৌহিণী সৈন্য যুটিল; পরিশেষে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাদের রথের সারথ্য কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এই দেখ কত দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল; পরিশেষে ঐ দেখ রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া রাজ্য-ধন, মান-ঐশ্বর্য্য,—সুখ-সম্পদ, দাস-দাসী, পুত্র-কলত্র সমুদায়ই তাঁহাদের পদতলে ন্যস্ত করিয়া প্রাণ ভয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের ভিতর যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, আর পাণ্ডবগণ বিজয়োল্লাসে কেমন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এই চিত্র সকলের সমক্ষে ধরিয়া কাশীরাম বলিলেন, এক্ষণে আর ক্ষমার কাল নাই—অনেক দিন ক্ষমা করিয়া দেখিয়াছ, আর কেন? তোমরা রামচন্দ্রের ন্যায় কার্য্য করিলে কি হইবে—এক্ষণে আর মহানুভব ভরত রাজ্যেশ্বর নহেন—দুর্য্যোধন সিংহাসনে আসীন। তোমরা যতই ক্ষমা করিতে থাকিবে, তোমাদের রাজা ততই হীনবল ভাবিয়া তোমাদিগকে পীড়ন করিতে থাকিবেন। এই সময় একবার পাণ্ডবগণের মত মাথা নাড়া দাও; তোমাদের ইষ্ট হইবে। রাজা প্রজার এই সম্বন্ধ দেখাইবার উদ্দেশেই কাশীরামের মহাভারত প্রণয়ন।) রামচন্দ্রের ভাব সমাজের

অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও তাহাতে কোন ফল না দর্শিবার জন্য, তিনি ভীমার্জ্জুনের চরিত্রে সমাজ সংগঠিত করিতে উপদেশ প্রদান করেন। কাশীরামের এই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশেই ঘনরাম ও রূপরাম ধর্ম্ম অবতার লাউসেনের বৃত্তান্ত সকলের সমক্ষে ধরিয়াছেন; তাঁহারা বলিতেছেন ধর্ম্মপথে থাকিলে প্রবল প্রতাপান্বিত পাত্র মহামদ বা গৌড়েশ্বরের ন্যায় লোকও তোমাদের নিকট নতমস্তক হইবেন; শক্তির সেবক দুর্ব্বৃত্ত ইছাইও তোমার অনায়াসবধ্য হইবে, অতএব ধর্ম্মপথে থাকিয়া লাউসেনের ন্যায় আপনার স্বত্ব রক্ষার্থে যত্নবান হও; পরিশেষে সুফল প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে।)

কবিগণের এইরূপ উপদেশে সমাজে কিঞ্চিৎ বলাধান হইয়াছিল কি? অবশ্যই হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। গ্রন্থকার বিশেষতঃ কবিগণের উপদেশ, বেত্র হস্ত গুরু মহাশয় বা উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকের উপদেশ হইতেও অধিক ফলোপদায়ক। ধর্ম্মযাজকগণ বেদীতে উপবেশন করিয়া যে সকল ধর্ম্মনীতি লোকের নিকট উপদেশ প্রদান করেন, কবির উপদেশের নিকট তাহাও অতি সামান্য;) যাজকগণের উপদেশ সকল চিরদিন মনকে নিমজ্জিত রাখিতে পারে না—কিছুদিন পরে তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়; কিন্তু কবি কোন নায়ককে হাঁসাইয়া—কাঁদাইয়া, তাহারই মুখ দিয়া যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা আর কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে—তাহা চিরদিন লোকের মনে সমান ভাবে রাজত্ব করিতে থাকে; আবার কবিগণের মধ্যে যাঁহাদের কাব্য যত অধিকতর আদৃত ও পঠিত হয়, তাঁহাদের ক্ষমতা অন্যান্য কবি

অপেক্ষা ততই অধিক—তাঁহারা ততই সামাজিক চরিত্র সংগঠনে কৃতকার্য্য হন। কাশীরাম দাস এই শ্রেণীর কবি; তাঁহার মহাভারতের যেরূপ আদর ও চর্চ্চা, বঙ্গভাষায় অন্য কোন গ্রন্থের সেরূপ নহে। সুশিক্ষিত কালেজের উপাধিধারী ব্যক্তি হইতে, অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মুদি পর্য্যন্ত সকলেই মহাভারতের সেবক। এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সেই ভয়ানক নির্য্যাতনের সময়েও যে, আদৃত ও পঠিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই;) সুতরাং তাঁহার উপদেশ নিচয় যে, সে সময়ে সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি? এবং সমাজ যে এই সকল উপদেশে অনেক বল প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতেই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কাশীরামের এইরূপ উপদেশ প্রদানের পর হইতেই বঙ্গীয় সমাজ নব-জীবন লাভ করে; কিন্তু সমাজ নব-জীবন লাভ করিতে আরম্ভ করিয়া কখন দুই বা চারি বৎসরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না; কথঞ্চিৎ সজীবতা লাভ করিতে অন্ততঃ পঞ্চাশৎ বৎসর কাল প্রয়োজন। আমরা এই জন্যই কাশীরামের পঞ্চাশৎ বৎসর পরে সমাজের বিভিন্ন প্রকৃতি পরিদর্শন করি।

সমাজে নূতন জীবন প্রবেশ পথ পাইলে শাসন কর্ত্তাগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তদবধি তাঁহারা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিভেদে দেশ শাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; মুরসিদকুলিখাঁর সময় হিন্দু মুসলমান উভয়েই প্রায় সমান হইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও হিন্দু সমাজে বিশেষ বলাধান হয় নাই, তাহাতেই তখনও মুসলমানগণের আধিপত্য একটু বেশী ছিল; এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মুরসিদ বাল্যকালে হিন্দু ছিলেন, ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম। যাহাই হউক, তাঁহার সময়ে ইংরাজ

বণিকগণ বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হইয়াছেন; তাঁহাদের প্রতাপ মুসলমানগণকে ধাঁধাঁইয়া দিয়াছে সুতরাং এ সময়ে বঙ্গীয় হিন্দু প্রজাগণ মুসলমানের উপর বিরক্ত থাকিলে নানা রূপ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কায় তাঁহারা এই সময়ে হিন্দুগণকে অধিক উৎপীড়ন করিতে সাহসী হন নাই; তাই দেখিতে পাই, এই সময়ের হিন্দুগণ কিছু শান্তি সুখ লাভ করিয়াছে। মুরসিদের পর সুজাউদ্দীন বাঙ্গালার নবাব হন; ইনি হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন; ইনিই দিল্লী হইতে "রাইরাঁইয়া" উপাধি আনাইয়া আলমচাঁদকে প্রদান করিয়া প্রথমে সম্মানিত করেন। সুজাউদ্দীন প্রজা শাসনের জন্য চারিজন সদস্য লইয়া একটি মন্ত্রীসভা সংস্থাপন করেন; ইহাতে দুইজন হিন্দু ও দুইজন মুসলমান স্থান লাভ করিয়াছিলেন, সেই হিন্দুগণের নাম জগৎ শেঠ ও রায় আলম চাঁদ। আবার ইঁহারই শাসন কালে, রামেশ্বরের আশ্রয় দাতা মেদিনীপুর জেলান্বিত কর্ণগড়াধিপতি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া ঢাকা নগরে গমন করেন। নবাব মুরসিদের সময়ে দেশীয় অনেক জমিদার রাজস্বের জন্য কারা-রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সুজা তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন; এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, এই সময়ে হিন্দুগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎপীড়িত না হইয়া মুসলমান প্রজার সহিত সমান সূত্রে গ্রথিত হইতেন। সুতরাং এই সময়ের হিন্দু সমাজে বিলাস প্রবেশ পথ পাইয়া ছিল; সুজাউদ্দীন নিজে অতিশয় বিলাসী ছিলেন; সুতরাং তাঁহার দৃষ্টান্ত সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইল; প্রজা সাধারণ বিলাসী হইয়া উঠিলেন। প্রজাগণ কতকটা শান্তি সুখ লাভ করিয়াছিল বলিয়াই বিলাস

তাহাদের মন আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল সন্দেহ নাই। এক্ষণকার হিন্দুগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য ছিলেন না। কাশীরাম দাস প্রভৃতির উত্তেজনায় হিন্দুসমাজে বলাধান হইয়াছিল—হিন্দুগণ আপনাদের স্বত্ব বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সুতরাং এই সময়ে নবাব হিন্দুগণকে কিঞ্চিৎ ভয় করিতেন। এই জন্যই সুজা মৃত্যুর সময় তদীয় পুত্র সরফরাজ্‌কে আলম চাঁদ ও জগৎশেঠের পরামর্শ মত কার্য্য করিতে শপথ করাইয়া যান। সুজা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বীর্য্য নহে; তাই তিনি পুত্রকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেন। কিন্তু উদ্ধত স্বভাব সরফরাজ্ ইঁহাদিগকে বিশেষ মান্য করিলেও কোন কারণ বশতঃ তাঁহাদের বিরাগ ভাজন হইয়া পড়েন। সরফরাজ্ কোন বিশেষ কারণ বশতঃ জগৎশেঠ ও তদ্বংশীয়গণের ক্রোধোদ্দীপন করিয়া দেন—সেই জন্যই তাঁহার আলিবর্দ্দীর হস্তে পতন। যাহা হউক, এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে যে, তখন বঙ্গীয় সমাজ নিতান্ত হীনবল ছিল না এবং এরূপ হইবার কারণ বঙ্গীয় কবিগণের ক্রমিক উপদেশ ও ইংরাজ, ফরাসী বণিকগণের দৃষ্টান্ত প্রভৃতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তাহা হইলেই দেখা গেল কাশীরাম, ঘনরাম, রূপরাম, রামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ বঙ্গ সমাজে যুগ প্রলয় সংসাধন করিয়াছিলেন।

কাশীরাম দাসের পর ভারতচন্দ্রের কাল: এই সময়ে আলীবর্দ্দীখাঁ বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; ইঁহার সময়ে বর্গীর হাঙ্গামা প্রভৃতি দুই একটি উপদ্রব ঘটিলেও প্রজাগণ সাধারণতঃ সুখে ছিলেন; এ সময়ে রাজার পীড়ন ততটা প্রবল ছিলনা বলিয়াই, প্রজাগণ কিয়দংশে শান্তি সুখলাভ করিতে পারিয়া

ছিলেন—কিয়দংশে বিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই শান্তিসুখসমন্বিত বিলাসী হৃদয়ের ফল বিদ্যাসুন্দর।) চণ্ডীকাদেবীর মূর্ত্তি বিশেষ এই সমাজের পূজা ছিল; সুতরাং এই সময়ের আমরা যে কোন গ্রন্থই দেখি না, তাহাতেই কালিকাদেবীর আবির্ভাব সন্দর্শন করিতে পারি। পূর্ব্ব হইতেই তন্ত্র সমাজে স্থান লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মুসলমানগণের অতি নিপীড়নের সময়ই ইহা কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ হয়, এক্ষণে সমাজের এই শান্তিময় অবস্থায় তাহা দ্বিগুণতেজে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিল; এই সময়ে অধিকাংশ লোকই তন্ত্রোপাসক হইলেন। সুতরাং এই সময়ের সমুদায় গ্রন্থই কালীদেবীর প্রাধান্য ও উপাসনা খ্যাপন করিয়াছে। সমাজ এই সময়ে সুরায় প্রমত্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়; কেন না সুরা তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। আমরা এই সময়ের দুই একজন কবিকেও সুরাপান করিতে দর্শন করি। রামপ্রসাদ সেন সুরাসেবী ছিলেন। যাহা হউক, এই কালের ভাষা সুরাপায়ী ব্যক্তির উদার মুক্তকণ্ঠের ন্যায় সবল ও সুমধুর; ইহাতে কোনরূপ আবর্জ্জনা নাই—সর্ব্বত্রই সুপরিষ্কৃত ও মসৃণ। ভারতচন্দ্রের সময় হইতেই বাঙ্গালাভাষা নূতন কালে প্রবেশ লাভ করিয়াছে; ভারতচন্দ্রই ইদানীন্তন কালের প্রথম কবি; ভাষার উপর তাঁহার যত ক্ষমতা ছিল, তেমন অন্য কাহারও দেখা যায় না। যেন ভাষা তাঁহার মুষ্টির ভিতরে অবস্থিত; তিনি ইচ্ছামত কখন তাহাকে হাসাইয়াছেন—কখন নাচাইয়াছেন এবং এইরূপ করিয়া তিনি সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছেন; তাঁহার ন্যায় শব্দ বিন্যাস করিতে এ পর্য্যন্ত কোন কবিই সমর্থ হন নাই। অনেকে বলেন ভারতচন্দ্রই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান

কবি ; কিন্তু এ কথায় আমরা আস্থা সম্পন্ন হইতে পারি না ; মুকুন্দরামের ক্ষমতার নিকট ভারতচন্দ্র তিষ্ঠিতেও পারেন না। ভারতচন্দ্র প্রায় সকল স্থলেই মুকুন্দরামের অনুকরণ করিয়াছেন ; তাঁহার অন্নদামঙ্গল খানি সম্পূর্ণরূপে অনুকরণের উপরেই স্থাপিত। গুণাকরের অন্যান্য নানাগুণ থাকিলেও কোন নূতন বিষয় অবতারণা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিলনা ; অন্নদামঙ্গলে কোন নূতন চরিত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতচন্দ্রের কল্পনা শক্তি কোন নূতন মূর্ত্তি উদ্ভাবন করিতে পারে নাই ; তাঁহার কল্পনা তত প্রখরা ছিল না ; তবে অপর কবির চিত্র তিনি সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিতে পারিতেন ;) কোন একটী অসম্পূর্ণ চিত্র তাঁহার সম্মুখে পতিত হইলে, তিনি তাহার মনোহর অঙ্গরাগ করিতে পারিতেন—তাহাকে নানাবিধ রমণীয় বেশ ভূষায় সাজাইতে পারিতেন—তাহাকে সুন্দর রঙ্গে রঞ্জিত করিতে পারিতেন ; এই জন্যই তাঁহার অনুকরণ মূল হইতেও স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির অভাব থাকিলেও, রচনা শক্তির প্রাখর্য্য বশতঃ তাঁহার কাব্য সকলেরই হৃদয়াকর্ষণ করিয়াছে ; সেই জন্যই তিনি কবি সিংহাসনের উচ্চাতোরণে অবস্থিত হইয়াছেন ; তাঁহার কাব্যকুসুমসৌরভে দিগ্বিদিক আকুলিত হইয়াছে ; বাস্তবিক ভারতচন্দ্র একজন অদ্বিতীয় কবি ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; ভাষা তাঁহার যেরূপ আয়ত্তাধীন, এরূপ অন্য কোন কবির ছিল কি না সন্দেহ। ভারতচন্দ্রের রচনা অতীব সরল ও কোমল ; যেন তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা ভাষা নব যৌবনে পূর্ণ বিকসিত ; সর্ব্বত্রই লাবণ্যময়ী—সকল অঙ্গই আপনার প্রভায় ঢল ঢল করিতেছে। বাস্তবিকই

তাঁহার রচনা যেমন চিত্তহারিণী, তেমনিই প্রভাময়ী; ইহাতে প্রাবৃটের বিদ্যুল্লতার বিকাশ নাই, ইহার সর্ব্বত্রই বাসন্তীয় মলয় মারুতের সুমন্দ উচ্ছ্বাস; ইহার কোন স্থানেই রণ-ভেরীর ভয়াবহ গর্জ্জন নাই, সকল স্থানেই মুরলী বীণার মধুর নিক্কণ আছে; মৃদঙ্গের পরিবর্ত্তে, তল মৃদঙ্গের মধুরধ্বনি ইহার সর্ব্বত্রই শ্রুত হওয়া যায়; সুতরাং ভারতচন্দ্র বীররসে মত্ত কালকেতু চিত্রিত না করিয়া, বিলাস রসে রসিক আদিরস মত্ত সুন্দর আঁকিয়াছেন; ফুল্লরার পরিবর্ত্তে বিদ্যা আনিয়াছেন।

আমরা দেখাইয়াছি কবিকঙ্কণের সময়ে বঙ্গীয় সমাজ কি প্রকার দুঃসহ যন্ত্রনা পাইতেছিল—কবিকঙ্কণ কি উদ্দেশ্যে চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে বঙ্গীয় সমাজের আর সে অবস্থা নাই; এক্ষণে আলিবর্দ্দী বঙ্গীয় সিংহাসনে আসীন—বিলাস রসের অবতার কৃষ্ণচন্দ্র রায় নব-দ্বীপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; তাই আদিরস প্রমত্ত ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, গোপাল ভাঁড় তাঁহার প্রধান সভাসদ।) তখন আর বঙ্গের সে দুঃখের অবস্থা নাই—তখন বঙ্গের চতুর্দ্দিক হইতে অত্যাচার জনিত হাহাকার শব্দ অশ্রুত হইয়াছে—বঙ্গবাসী তখন কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছেন—অনেক দিনের পর আর একবার সুখের আস্বাদ পাইয়াছেন; সুতরাং তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না—সুখের স্রোতে একবার গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সুখের উৎস স্বরূপ; বঙ্গবাসী সেই উৎস জলে সন্তরণ দিতেছেন। আবার বাঙ্গালী শান্তিলাভ করিলেই বিলাসী হইয়া পড়েন; বিলাসই বঙ্গবাসীর চিরন্তন অভ্যস্তধর্ম্ম; এই বিলাস পরায়ণতার জন্যই বঙ্গসমাজ নানা সময়ে,নানারূপে নিপী-

ড়িত হইয়াছে; এই জন্যই রত্ন-প্রসবিনী বঙ্গভূমি নানা রত্ন প্রসব করিলেও বীর রত্ন প্রসব করেন নাই; রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় সুখের সময়—শান্তির সময়—তাই এ সময়ে বিলাস বিশেষ রূপে আপনার আধিপত্য প্রকাশ করিয়াছিল; সেই বিলাসের বিশেষ প্রভুত্ব খ্যাপনের ফল বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল উপাখ্যান। এই সময়ে আমরা ভারতচন্দ্র কেন, নানা লোক প্রণীত বিদ্যা-সুন্দর দেখিতে পাই। এই সমাজের রাজা হইতে দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই, এই বিদ্যাসুন্দরে সমান আনন্দ—সমান তৃপ্তি—সমান প্রীতি। রাজা এই রুচির প্রশংসা করিতেছেন—প্রজা সাধারণ করিতেছেন, সুতরাং উপর্য্যুপরি চারিখানি বিদ্যাসুন্দর সংরচিত হইল। এই সমুদায়ই তদানীন্তন কদর্য্য সামাজিকতার ফল; সমাজ অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ—তদানীন্তন গ্রন্থ সকলও তাই; ভারতচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই কালিকা দেবীর প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতে সমুৎসুক, কিন্তু এই কারণ বশতঃই তাঁহারা আপনাপন গ্রন্থে এত অশ্লীলতা স্পৃষ্ট আদিরসের ছড়াছড়ি করিয়াছেন। এই জন্যই ভারতচন্দ্র চণ্ডীকাব্য হইতে সৃষ্টিপ্রকরণ অবধি হর-পার্ব্বতীর সমুদায় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেও, চণ্ডীর মাহাত্ম্য খ্যাপক কালকেতুর আখ্যায়িকার পরিবর্ত্তে, আদিরস পূর্ণ বিদ্যাসুন্দরের উপখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন; উভয়ের উদ্দেশ্য সমান হইলেও বিভিন্ন সামাজিকতার জন্য, উভয়েরই কল্পনা বিভিন্ন পথে দাঁড়াইয়াছে। এই অশ্লীল কল্পনায় ভারতচন্দ্রের কিছুমাত্র দোষ নাই; ইহা সময়ের সমাজের দোষ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় যেরূপ গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি বিদূষকগণের অশ্লীল রসালাপের বিষয় জনপ্রবাদ আছে, তাহাতে তাঁহাকে অশ্লীলতাপ্রিয়

রাজা বলিয়াই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়; সুতরাং তাঁহার প্রিয় কবিগণ কেন না আদিরসে নিমজ্জিত হইবেন? তখন সাধারণ লোকের প্রবৃত্তিও এইরূপ; সুতরাং এরূপ গ্রন্থ সে সময়ে যে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? এই জন্যই এ সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডী উপেক্ষিত হইয়া অন্নদামঙ্গল সিংহাসন লাভ করিয়াছে; সেই অবধি বঙ্গভাষায় কেমন এক প্রকার একটানা বহিতেছে যে, তাহা আর কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। ভারতচন্দ্রের সময় হইতেই বঙ্গভাষায় প্রেমের গীতি স্থান লাভ করিয়াছে; তদবধি অন্যান্য কাব্য সুদূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া গীতি কাব্যের আদর বাড়িয়াছে—গীতি কাব্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছে; এক্ষণে যে আমরা বঙ্গ ভাষায় শত শত গীতিকাব্য দেখিতে পাই, তাহা এই সামাজিকতার প্রসাদে। ভারতচন্দ্রের সময়ে সমাজ যে প্রকার নিশ্চেষ্ট—সুখপরায়ণ ও আদিরসে বিভোর, সেইরূপ তাঁহার কবিতা কলাপ যে, সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাহার উপর ভারতচন্দ্র একজন যথার্থ কবিত্বগুণ সম্পন্ন কবি ছিলেন; যদিও তাঁহার কল্পনার কোন অদ্ভুত প্রসারণ ছিল না ও তাহা কোন নূতন চিত্র উদ্ভাবন করিতে পারে নাই, তত্রাপি তিনি অপরের কল্পিত চিত্রগুলি যেরূপ বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন—যেরূপ নানাবিধ বেশ ভূষায় সুশোভিত করিয়াছেন, তাহাতে সে গুলি অপর হইতে গৃহীত ইহা জানিবার কোন উপায়ই নাই; যেন সে গুলি তাঁহারই নিজের কল্পিত চরিত্র। যাহা হউক, ভারতচন্দ্র বঙ্গভাষার একজন প্রধান কবি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; অশ্লীলতা দুষ্ট স্থানগুলি পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার রচনা অতীব প্রীতিপ্রদ। ভারতচন্দ্র

চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যথা, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, ও রসমঞ্জরী; এতদ্ব্যতীত তাঁহার সত্যনারায়ণের কথা, সংস্কৃত নাগাষ্টক, চণ্ডী নাটক প্রভৃতি অনেক খণ্ড কবিতা আছে। ভারতচন্দ্রের অনেক রচনা সংস্কৃত, হিন্দী, পারসী ও উর্দ্দূ মিশ্রিত; ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, তিনি ঐ সকল ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ভারতচন্দ্রের সময়ে ইয়ুরোপীয়গণ ভারতে বদ্ধমূল হইয়াছেন। ইংরাজগণ বঙ্গদেশে শনৈঃ শনৈঃ আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে অগ্রসর হইতেছেন; তাঁহারা তখন নানা স্থানে কুঠি সংস্থাপন,—নানা স্থানে জমিদারী গ্রহণ ও কলিকাতায় তাঁহাদের প্রধান আড্ডা স্থাপন করিয়াছেন; তথায় দুর্গ নির্ম্মিত ও তাহাতে অনেক ইংরাজ সৈন্য রক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্যের জন্য তাঁহাদিগকে যে তিন সহস্র টাকা বার্ষিক শুল্ক স্বরূপ দিতে হইত, নবাব তাহা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করায়, ইংরাজগণ তাহা লইয়া মহা হুলস্থূল করিয়া আপনাদের অভীষ্ট সংসাধন করিয়া লইয়াছেন; তাঁহারা বঙ্গদেশের অবস্থা—প্রজার অবস্থা—রাজার অবস্থা ও বল বিশেষরূপে বুঝিয়া লইয়াছেন এবং বঙ্গভূমি তাঁহাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলে তাঁহারা কিরূপ লাভবান হইতে পারেন, তাহাও সেই সামান্য দিনের বাণিজ্যেই বেশ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন; সুতরাং একজন সূক্ষ্মদর্শী লোক ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বেই বলিতে পারিতেন যে, মুসলমান ভাস্কর অস্তগতপ্রায় হইয়া আসিয়াছে; মুসলমান রাজ্যাবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই।

* মুসলমানগণও ঐ সময়ের মধ্যেই ইংরেজের বল বিক্রম

বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাহার উপর, বঙ্গবাসীগণ তাঁহাদের সহিত যোগ দিলে কি হইবে তাহাও বুঝিয়াছিলেন; তাই ইংরাজের বঙ্গদেশ প্রবেশের প্রায় প্রথম হইতেই, তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। পরে যখন নবাবগণ দেখিলেন, ইংরাজ বণিক বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হইলেন, তখন আর বঙ্গীয় প্রজার সহিত সদ্ভাব না রাখা বিপদ-জনক। এই জন্যই চির অত্যাচারী মুসলমানগণ হিন্দু প্রজার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন; তাহাতেই দুই একজন বঙ্গবাসীকে প্রধান প্রধান পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর সময়ে হিন্দু মুসলমান একই সূত্রে গ্রথিত; সকলের সহিত তাঁহার সমান সদ্ভাব ছিল; কিন্তু তৎপরেই ভীষণ প্রকৃতিক সেরাজুদ্দৌলা বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিলেন; তাঁহার নিকট হিন্দু, মুসলমান সকলেই সমান রূপে পীড়িত, সুতরাং সকলেই তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ—সকলেই তাঁহার ধ্বংশ কামনায় সমান উৎসুক; সেরাজুদ্দৌলার এইরূপ অত্যাচারই তাঁহার অধঃপতনের কারণ। শেষ মুসলমান নবাবের এইরূপ অত্যাচারের ফল, মুসলমান রাজত্বের ধ্বংশ ও ইংরাজ বণিকবৃন্দের রাজ্য লাভ। এই ভয়ানক রাষ্ট্র বিপ্লব ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরে সংসাধিত হয়; সুতরাং আমরা এস্থলে আর তাহা উল্লেখ না করিয়া ভারতচন্দ্রের সম-সাময়িক অন্যান্য কবির বৃত্তান্ত প্রদান করিব। এই সময়ের অপর কবি অনুসন্ধান করিলে আমরা কৃষ্ণরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেককে দেখিতে পাই। কৃষ্ণরাম দাস কায়স্থ কুলোদ্ভূত—রামপ্রসাদ সেন বৈদ্য বংশজ ও প্রাণরাম ব্রাহ্মণ;

ইঁহারা সকলেই বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন। রাম-প্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত কালী-কীর্ত্তন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, কালিকা-মঙ্গল প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে; কিন্তু তাঁহার প্রণীত গীতগুলিই তাঁহার অমরত্বের নিদান; বাঙ্গালাভাষা যত দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন রামপ্রসাদ কেবল ইহার জন্যই সকলের প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইবেন; কৃষ্ণরাম দাস কবিত্ব শক্তি বিষয়ে বিশেষ প্রভান্বিত না থাকিলেও সামান্য কবি ছিলেন না; বিশেষতঃ তিনি যখন সর্ব্ব প্রথমে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন, তখন তিনি বিশেষ রূপে মান্য পাইবার উপযুক্ত; তাঁহার রচনা ভারতচন্দ্রের রচনার ন্যায় সুমিষ্ট ও সুললিত, পরিপাটী ও মার্জ্জিত। রামপ্রসাদ একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন; আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহার প্রণীত অনেক গ্রন্থ থাকিলেও তৎকৃত পদাবলীই তাঁহার অমরত্বের নিদান, সেই গীতগুলি অতীব মনোহর ও প্রীতি উন্মেষক; দেখিলেই বোধ হয়, যেন সেগুলি একজন যথার্থ ভক্ত সুকবির মর্ম্মস্থল হইতে আপনা হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে; তাহাতে কিছুমাত্র কাঠিন্য নাই—কষ্ট কল্পনার লেশ মাত্র নাই,) যেন সকল গুলিই সরলতা গ্রথিত—যেন সকলগুলিই অন্তরের নিভৃত কক্ষস্থিত ভক্তি পুষ্পে সংরচিত; তাঁহাকে কোন কথা ভাবিতে হয় নাই—কোন উপমা অনুসন্ধান করিবার জন্য আকাশের দিকে চাহিতে হয় নাই—তিনি সম্মুখে যাহা পাইয়াছেন তাহাই তাঁহার উপমার স্থল—তাহা হইতেই তিনি ভক্তি কুসুম চয়ন করিয়া মালা রচিয়াছেন।

রামপ্রসাদ একজন প্রধান ভক্ত ও প্রধান কবি ছিলেন; তাঁহার মত ভক্ত কবি আর দেখিতে পাই না; সুতরাং তাঁহার

কৃত ভক্তির উৎস স্বরূপ পারমার্থিক পদাবলী যে, অতীব প্রীতিকর ও মনোহর হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বাস্তবিকই যখন আমরা নিশীথ কালের নিস্তব্ধ অবস্থায় তাঁহার গীতাবলী শ্রবণ করি, তখন মনে যে কি অভূত পূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রামপ্রসাদের এই অকৃত্রিম গীতগুলিতে বাহ্যাড়ম্বরের ঘোর ঘটা নাই—সেগুলি রচনা করিবার সময় তাঁহাকে নানাবিধ উপকরণ আনিবার জন্য দেশ দেশান্তরে গমন করিতে হয় নাই। তাঁহার গীতাবলী তাজমহল নহে, সুতরাং তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য সমুদ্র পার হইয়া, ইয়ুরোপ ভ্রমণ করিতে হয় নাই—যেখানে যাহা কিছু রত্ন আছে, তাহা আনিবার জন্য যত্ন পাইতে হয় নাই; তাঁহার গীতাবলী একটী সামান্য পর্ণ কুটীর মাত্র; দেশীয় মৃত্তিকা দেশীয় বংশ পত্রাদি ভিন্ন অন্য উপকরণ আর কিছুই নাই; ইহাতে কারুকার্য্যের প্রাচুর্য্য নাই; সকলই যেন স্বভাবের হস্ত হইতে বিনির্গত হইয়াছে। কোলাহল পূর্ণ মহানগরীর অত্যুচ্চ সৌধমালা সন্দর্শনের পরই, প্রকৃতি দেবীর বৈচিত্র্যময়ী কাননের মধ্যস্থিত লতাকেতন সন্দর্শন করিলে মনে যে প্রকার অতুল আনন্দের উদয় হয়, এক্ষণকার নানাবিধ বৈদেশিক ভাব মিশ্রিত সুন্দর কাব্য কলাপ পাঠান্তে, রামপ্রসাদের পদাবলীকুঞ্জে প্রবেশ করিলে মনে ঠিক সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে; ইহাতে মহানগরীর কোলাহল নাই—সুপরিস্কৃত গৃহরাজির রাজীব শোভা নাই—দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় সিংহদ্বার নাই; ইহাতে নগরের কুটিলতা—পরশ্রী কাতরতা নাই; ইহার সকলই সরলতা, সকলই উদারতা, সকলই স্বাভাবিক। ইহাতে জন কোলাহলের পরিবর্ত্তে,

স্বভাবজাত পাদপ বাজির মনোমুগ্ধকর মর্ম্মর শব্দ আছে—কৃত্রিম সরিতের কৃত্রিম শোভার পরিবর্ত্তে, অকৃত্রিম উৎসের অকৃত্রিম শোভা আছে; ইহার কোথাও গ্যাস বা তাড়িতালোক নাই—ইহার সর্ব্বত্রই পৌর্ণমাসীর রজত ছটা। যাহা হউক, রামপ্রসাদের পদাবলী সকল সম্পূর্ণ রূপে অকৃত্রিম; সেগুলি যেন কবির লেখনী হইতে অনর্গল নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহার কল্পনা সুরঞ্জিত করিবার জন্য তাঁহাকে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে হয় নাই; তিনি সম্মুখস্থ সকল পদার্থই মনোহর করিয়ে বিভাবিত করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার গীতিগুলি অতিশয় সহজ ও কোমল; তাহা সকলেরই প্রীতিপ্রদ ও মনোহর। কিন্তু রামপ্রসাদের গীতগুলি যে প্রকার উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে, তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি কবি সমাজে সে স্থান লাভ করিতে পারে না। কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের পর, ভারতচন্দ্র গ্রন্থ রচনা না করিলে, তিনি এ বিষয়ে মান্য পাইতে পারিতেন; কিন্তু ভারতচন্দ্র তাঁহার পর বিদ্যাসুন্দরের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাঁহার সুন্দরকে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিয়াছেন; তবে যে কবিরঞ্জন ইহাতে কিছুই কবিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই তাহা নহে; রামপ্রসাদও স্থানে স্থানে বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ইঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলিও এই প্রকার; এই সকলেরই স্থানে স্থানে প্রচুর কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে। তবে রামপ্রসাদের রচনার একটী মহৎ দোষ এই, তিনি অতিশয় অনুপ্রাস প্রিয় ছিলেন; এই অনুপ্রাসের অনুরোধে স্থানে স্থানে তাঁহাকে এমন শব্দ সকল বিন্যাস করিতে হইয়াছে যে, সেগুলি পাঠ করিতেও কষ্ট বোধ হয়; আবার তাঁহার রচনার প্রধান গুণ

এই যে, ভারতচন্দ্র যেমন কখনও হিন্দী—কখনও সংস্কৃত—কখনও পারসী—কখনও বা উর্দ্দূ ইত্যাদি নানা ভাষা মিশ্রিত বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাহা কখন করেন নাই। তিনি বোধ হয় নানা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, কেবল সংস্কৃত জানিতেন, তাহাতেই তাঁহার গ্রন্থে কোন প্রকার বৈদেশিক ভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহার সমুদায়ই তাঁহার স্বদেশীয় ও তাঁহার নিজের সম্পত্তি; তিনি ধার করা বুলি বা ভাব ব্যবহার করেন নাই;) তিনি আপনার সম্পত্তিতেই আপনার মাতৃভাষাকে বিভাষিত করিয়া গিয়াছেন। এই সমাজে আরও দুই একজন কবি বর্ত্তমান ছিলেন; প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী এই সময়েই কালিকা মঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ন করেন; ইহার উপাখ্যান ভাগ প্রায় ভারতের সুন্দরের সমান, কিন্তু প্রাণরাম ইহাতে ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী এই সময়েই সংরচিত হয়; দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা।

ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরেই বঙ্গদেশে এক ভয়ানক রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়; এই সময়েই সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর পরে, বঙ্গীয় রাজলক্ষ্মী নিতান্ত নিগৃহীতা হইয়া মুসলমান অঙ্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ অবধারণ করাও দুষ্কর নহে; যে যে কারণবশতঃ সপ্তদশজন মাত্র অনুচর লইয়া, বক্তিয়ার খিলিজী ইহার সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গরাজ্য করতলস্থ করিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণেও ঠিক সেই সেই কারণ গুলিই বিদ্যমান ছিল; তাহার উপর আর একটি কারণ যুক্ত হইয়াছিল। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দর এক প্রকৃতির গ্রন্থ; গীতগোবিন্দ আলস্য

নিশ্চেষ্টতা ও গৃহসুখ নিরতির ফল; যখন সমাজ অতিশয় স্থবির, ইন্দ্রিয়পর ও অলস হইয়া পড়িয়াছে—যখন ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করাই জীবের একমাত্র কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে—গীতগোবিন্দ সেই সময়ে প্রণীত হয়।) সমাজ তখন নিশ্চেষ্ট—গতিহীন—ক্রিয়াহীন;) সমাজের এইরূপ হীনাবস্থা জন্যই বক্তিয়ার খিলিজীর আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই আজন্ম রাজা লাক্ষ্মণেয় উত্তোলিত ভোজনগ্রাস ভোজন পাত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া, অন্তঃপুর দ্বার দিয়া নৌকা যোগে প্রস্থান করিলেন; বিনা রুধির পাতে—বিনা বাক্যব্যয়ে বঙ্গরাজ-সিংহাসন তাঁহার আয়ত্তাধীন হইল; এমন হীন রাজপরিবর্ত্তন অন্য কোন জাতির, কোন ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় না। শত্রুর আগমন সংবাদ মাত্রেই কোন রাজা অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন নাই। ইহা কেবল নিশ্চেষ্ট—অলস সমাজের ফল; এই আলস্য—ইন্দ্রিয় পরতা ও নিশ্চেষ্টতা জন্যই আজন্ম রাজার, অশীতি বৎসর রাজত্ব করিয়াও রাজ্যের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মমতা হইল না। তাহার পর এই পাঁচশত বৎসর পরেও বঙ্গীয় সমাজ পুনরায় সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে; আবার সমাজে সেই নিশ্চেষ্টভাব—সেই ইন্দ্রিয় পরায়ণতা—সেই আলস্য প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেই নিশ্চেষ্ট সমাজের ফল বিদ্যাসুন্দর। এক্ষণে কেবল হিন্দু নহে—মুসলমান সমাজ পর্য্যন্ত সেই দশা-গ্রস্থ হইয়াছে; সুতরাং রাজ পরিবর্ত্তন অলঙ্ঘনীয়। তাহার উপর আর একটি বিশেষ কারণ এই যে, বঙ্গীয় পূর্ব্বতন নবাবগণ ইংরাজের বল বিক্রম বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন—তাঁহারা যে কেবল বাণিজ্য বিস্তার জন্যই এদেশে আগমন করেন নাই

তাহা ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেই জন্য পাছে কোন গৃহ বিবাদ সর্ব্বনাশের মূল হয়, এই কারণে তাঁহারা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়াছিলেন; সুজাউদ্দীন—আলিবর্দ্দী, হিন্দু-মুসলমানকে সমান চক্ষে দর্শন করিতেন; সুতরাং তাঁহাদের সময়ে বিপ্লবের তত আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু এক্ষণে সিরাজুদ্দৌলা বঙ্গের সিংহাসনে আসীন; তিনি হিন্দু মুসলমান সকলকেই সমান পীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন-সুতরাং সকলেই এই ক্রূরকর্ম্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সচেষ্টিত হইলেন; এ দিকে পূর্ব্ব হইতেই লোকে ইংরাজ বণিকবৃন্দের অসীম ক্ষমতা সন্দর্শনে তাঁহাদের বশীভূত হইয়াছিলেন; এক্ষণে সকলেই নবাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ইংরাজ বণিক নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে ছিলেন; এক্ষণে এই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাঁহারা রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও রাজ কর্ম্মচারীর সহিত নবাবের ভেদ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিবৃন্দ ও মীরজাফর প্রভৃতি রাজ কর্ম্মচারীগণ ক্রমে ইংরাজের বশীভূত হইলেন; সুতরাং মুসলমান রাজ্যের আর ভরসা কোথায়? আবার এমন সময়ে সুচতুর ক্লাইব ইংরাজ সেনা নায়ক। এক্ষণে ইংরাজ বণিক নবাবের সহিত যুদ্ধের ছল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; দুর্ব্বৃত্ত রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাস হইতে তাহা সংসাধিত হইল; তবে আর যুদ্ধের বিলম্ব কি? ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাসী ক্ষেত্রে উভয় পক্ষীয় সৈন্যবৃন্দ যুদ্ধার্থ উপস্থিত; যুদ্ধ আরম্ভ হইল; নবাবের প্রধান সেনাপতি দুর্ব্বৃত্ত মীরজাফর আপন সৈন্য

সমেত চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মান; তাঁহার আশা ইংরাজবণিক ক্ষেত্র লাভ করিলেই তিনি বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন হইবেন; রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি-গণের আশা তাঁহারা কোনরূপে নবাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে ইংরাজকে দূরীভূত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন; তাঁহারা মনেও ভাবেন নাই যে, দাসত্বের পরিবর্ত্তে চির দাসত্ব শৃঙ্খল গলায় পরিতেছেন; যাহা হউক, নানা প্রকার কৌশলে ইংরাজ বণিক ক্ষেত্র লাভ করিলেন; সেই অবধি ইংরাজ আর বণিক নহে; তাঁহারা দেশের রাজা হইয়া বসিলেন; সকলের আশা ভরসা সমূলে নির্ম্মূল হইল; ক্রমে ক্রমে সমুদায় ভারত ইংরাজের পদানত হইল; এই ভয়ঙ্কর রাজবিপ্লবে সমুদায় বঙ্গ বিপ্লুত হইল। কোন বিপ্লবের পরে রাজ্যে যে সকল অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে বঙ্গদেশ তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল না; ইহার সকল স্থলেই দুর্ব্বলের উপর দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার প্রবল হইল—দেশময় অরাজকতা স্থান পাইল; দিনে বলবানের অত্যাচার,—রাত্রিকালে দস্যুগণের অত্যাচার; এইরূপ অত্যাচারে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইল; এই অত্যাচার নিবারণ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিতে ইংরা-জের অনেক দিন লাগিয়াছিল; কিন্তু সম্যক শান্তি স্থাপিত না হইতে হইতেই বঙ্গদেশ এক ভয়ানক নৈসর্গিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইল; ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গে অনাবৃষ্টি নিব-ন্ধন ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ভয়ঙ্কর মন্বন্তর উপস্থিত হইল। লক্ষ লক্ষ প্রাণী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল—আর কত স্থানে লুণ্ঠন, হত্যা প্রভৃতি ভীষণ অভিনয় হইতে লাগিল তাহার গণনা কে করিতে পারে? এই দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশের এত লোক নষ্ট

হইয়াছিল যে, মৃত দেহ স্পর্শ না করিয়া এক পদ অগ্রসর হইবার ক্ষমতা ছিল না—এবং বঙ্গদেশ এক্ষণেও সম্যকরূপে সেই ক্ষতির পূরণ করিয়া উঠিতে পারে নাই; ইংরাজরাজই এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কারণ; তাঁহারা ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে অজন্মা হইলেও আপনাদের রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিতে ত্রুটি করেন নাই; লোকের যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ বা খাদ্য ছিল, তৎসমুদায়ই রাজস্বের দায়ে তাঁহাদিগকে দিতে হইয়াছিল; অবশেষে সকলে উদর জ্বালায় আগামী বৎসরের জন্য সঞ্চিত শস্য বীজ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন; তাহার উপর সে বৎসরও অনাবৃষ্টি; সুতরাং আর উপায় কি? উদর জ্বালায় সকলে ব্যতিব্যস্ত হইল—সকলে দলে দলে রাজধানী অভিমুখে ছুটিতে লাগিল; বিষ্ণুপুরাধিপতি এই দুর্ভিক্ষে অন্নদান করিয়াই নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন; এই দুর্ভিক্ষোপলক্ষে তিনি যত টাকা কর্জ্জ করিলেন তাহা আর কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারিলেন না; সুতরাং তাঁহার রাজ্য বিক্রীত হইল। পশ্চিমবঙ্গ হইতে দলে দলে লোক কলিকাতাভিমুখে ছুটিতে লাগিল; ইংরাজ রাজ সে সংবাদ রাখিলেন না; ক্রমে ক্রমে ইংরাজের বিলাস ভবনের বারাণ্ডার সম্মুখ দিয়া, গঙ্গার উপর সহস্র সহস্র শব ভাসিয়া যাইতে লাগিল; ইংরাজরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল; উঠিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে মৃত দেহ ও প্রজাবৃন্দের হাহাকার ধ্বনি; মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রতি ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় ইংরাজ দুর্ভিক্ষ দমনে চেষ্টিত হইলেন; তখন ঔষধের সময় অতীত হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা প্রশমনের জন্য তাঁহারা কোষাগার হইতে নগদ ৪০০০০ টাকা বাহির করিলেন; টাকা আবার সুপাত্রে ন্যস্ত হইল, সেই সুপাত্র

ইংরাজ কর্ম্মচারী লক্ষ লক্ষ প্রাণী হত্যার পাতক হইয়া, সেই অর্থ অক্লেশে আত্মসাৎ করিলেন (১); ধন্য ইংরাজ! তোমার বদান্যতা—তোমার দয়াশীলতাকে শত সহস্র নমস্কার। যাহা হউক, তদানীন্তন ইংরাজগণের ধন লাভেচ্ছা এতাদৃশ বলবতী ছিল যে, তখন তাঁহারা কোন প্রকার পাপ কার্য্যই অকরণীয় জ্ঞান করেন নাই; যেমন করিয়া হউক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত।

বঙ্গের এরূপ উপপ্লবের সময় জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ অসম্ভব; যৎকালে সকলেই উদরান্নের জন্য লালায়িত—দস্যু-

---

(১) "They believed the guilt lay at the door of their own countrymen high in office, and called for disclosure of their names: but the names were never audibly disclosed. One who held an important place at the time, returned to his own country, a wealthy man, founded a family since ennobled, and amid "honour, love, obediance, troops of friends," lay down to spend the evening of his days in peace. But the best of blessings was denied him. His nights were haunted by images and sounds which would not let him sleep; and though a man of what is called iron frame and of ready courage, to his dying hour he never would allow the lights to be extinguished round his bed".

W. M. Torrens' "Empire in Asia". Page 77.

গণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সচেষ্টিত, তখন কবিতা দেবীর আরাধনা কোথা হইতে হইবে; সুতরাং এ সময়ে আমরা কোন উৎকৃষ্ট কবি দেখিতে পাই না। বঙ্গদেশ কথঞ্চিৎ অরাজকতা ও ভীষণ দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে আমরা নির্ব্বাপিত দীপের অগ্নিমুখী বর্ত্তিকা সদৃশ একটি কবির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকি; ইহার নাম নিধিরাম গুপ্ত। এই সময়ে বঙ্গদেশে এক প্রকার কবি উদিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সাধারণতঃ কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিধিরাম গুপ্তও কতকটা সেই প্রকার ছিলেন; তবে কতিপয় গীত রচনা করিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহার রচিত গীতগুলি সাধারণতঃ "নিধুবাবুর টপ্পা" বলিয়া অভিহিত, এবং ইহার অধিকাংশ গীতই অশ্লীলতা দুষ্ট; তবে মধ্যে মধ্যে দুই একটী গীতে উচ্চতর প্রেমেরও আদর্শ আছে; এবং সেগুলি বেশ প্রীতিকর ও মনোহর। নিধুবাবুর রচনা বেশ সুললিত ও মার্জ্জিত; আমরা এই স্থলে তাঁহার প্রণীত একটী গীত উদ্ধৃত করিলাম; —

দুঃখ দিবে বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুঃখে সুখ জ্ঞান করি যতনে তায় তুষিব॥
না থাকে তাহার মন, করিবে না আলাপন,
তবু সে বিধুবদন,
দূরে থেকে দেখিব।

এইরূপ তাঁহার গীতের স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব শক্তির প্রকাশ আছে; তবে অধিকাংশই আদিরস গ্রথিত। নিধুবাবুর প্রণীত গীতগুলি পুস্তকাকারে "গীতরত্ন" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; কিন্তু সে গুলি রত্ন না হইলেও অল্প মূল্যবান

নহে; তাহাদিগকে রত্নের সহিত অক্লেশে মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। রাজ পরিবর্ত্তনের পর তিনিই প্রথম কবি; নিধিরাম সেই দুঃসময়ে যে কথাটি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহা শতবৎসর পরে বঙ্গদেশে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে—তিনি সেই সময়ে যে মহান উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এতদিন পরে তাহার ফল ফলিতেছে; তিনি বলিয়াছিলেন;—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা॥

এই উপদেশ বাক্যটির গভীর অর্থ এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালী অধম জাতি; তাহার গরীমা করিবার কিছুই নাই—বাঙ্গালী আত্মগৌরব করিতে পারেন এমন কোন কার্য্য কখন করেন নাই; তাঁহাদের জীবনে আলোক মাত্র নাই; সর্ব্বত্রেই নিরাশা—সর্ব্বত্রই অন্ধকার; বাঙ্গালী প্রতিপদ বিক্ষেপেই নিরাশা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না; এক্ষণে সেই ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যে অতিদূরে একটি ক্ষীণালোক স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছে; বাঙ্গালী কোন কার্য্যের জন্যই জগৎ সমক্ষে দাঁড়াইতে পারেন না, কেবল একটির জন্য তাঁহারা গৌরব করিতে পারেন; সেটি নিধিরাম গুপ্তের মহান উপদেশ বাক্যের ফল। বাঙ্গালী জগৎ সমক্ষে সদর্পে বলিতে পারেন, এই দেখ পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ভাষা কি ছিল অদ্য কি হইয়াছে; পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে যে ভাষায় প্রেমের মধুর গীতি বা অত্যাচারের মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ হইত না; এক্ষণে তাহাতে মিল—ডার্ব্বিনের তত্ত্ব সকল সমালোচিত হইতেছে; বিস্‌মার্ক—গ্লাডষ্টোনের কূটতর্ক-বিতর্কের সমালোচনা হই-

তেছে ; ম্যাটসিনী—নেপোলিয়নের জীবনী অনুবাদিত হই-তেছে ; এক্ষণে সে ভাষা আর শুধু প্রেমের ভাষা নহে—ইহাতে প্রিয় ভাব ও ভীম ভাব সমুদায়ই ব্যক্ত করা যায়। বাঙ্গালী যদি কিছু গৌরব করিতে পারেন তবে তাহা এই ভাষার জন্ম ; তিনি এই সামান্য দিনের মধ্যেই ভাষার যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, এরূপ পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই কখন সম্পাদন করিতে সমর্থ হন নাই ; সুতরাং তাঁহার ভবিষ্যৎ নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় নহে। যে বাঙ্গালী এত অল্প-দিনের মধ্যে ভাষা সম্বন্ধে এতাদৃশ যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় কোন কার্য্যই অসাধ্য নহে। তাঁহারা সকল কার্য্যেই সমান প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন। তবে স্বাধীন চিন্তা বহুকাল হইতেই বাঙ্গালীর নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছে,) তাহা প্রাপ্ত হইতে এখনও বহু বিলম্ব ; যাহা হউক তাঁহাদের ভবিষ্যৎ আর নিরবচ্ছিন্ন কুহেলিকাপূর্ণ নহে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ইংরাজ রাজ্যারম্ভের সময়েই কবি-ওয়ালাগণ সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। নিধিরাম গুপ্ত নিজে একজন কবিওয়ালা ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার কবি ব্যবসায় ছিল না ;) তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়াকোম্পানীর কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু অপর কতকগুলি লোকের ইহা ব্যবসায় ছিল ; এই দলের মধ্যে হরুঠাকুর ও রাম রাম বসু প্রভৃতি প্রধান। এই সময়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ইহাদের উৎসাহ দাতা ছিলেন ; তাঁহাদের উৎসাহেই ইহাদের দল পরিপুষ্ট হয় ; যাহা হউক, এই কবিওয়ালাদের মধ্যে দুই একজন অতি উচ্চ দরের কবি ছিলেন,; তাঁহাদের রচনা যেমন সুন্দর, তেমনিই

প্রীতিকর; তাঁহাদের কবিতা যেন স্বভাবের হস্ত হইতে বিনির্গত হইয়াছে, যেমন মধুর—তেমনই মনোহর। কবিওয়ালাগণের মধ্যে হরুঠাকুরই সর্ব্ব প্রধান; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার রচিত প্রায় সমুদায় গীতই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রামরাম বসুর বিরহ অতিশয় বিখ্যাত; তাঁহার আগমনী ও সখি সংবাদও নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে; তিনি দুই একটি গীতে এরূপ অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে আহ্লাদে সর্ব্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠে। তিনি অন্তর ও বাহ্য জগদ্বর্ণনায় অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন; ইঁহার রচনায় কষ্ট কল্পনার লেশ মাত্র নাই—সকলই সরল—সকলই সুন্দর—সকলই মনোহর।) আমরা এই স্থানে তাঁহার একটী গীত উদ্ধৃত করিলাম;—

মহড়া।

মনে রৈল সই মনের বেদনা।

প্রবাসে, যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি বলা হলো না॥

সরমে মরম কথা কওয়া গেলনা॥

যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,

নির্লজ্জা রমণী বলি হাসিত সব লোকে,

সখি ধিক্ থাক আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,

নারীজনম যেন করেনা॥

চিতেন।

একে আমার এ যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এল,

এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।

যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,

সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে,

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছিছি ধরোনা ॥

অন্তরা।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম স্বজনি ;
অনায়াসে, প্রবাসে, গেল সে গুণমণি ,
এ কি সখি ! হলো বিপরীত, রেখে লজ্জার সম্মান,
মদন দহিছে এখন ও অবলার প্রাণ ;
যদি সে হলো নিদয়, লইল বিদায়,
তবে যেন সখি প্রাণও রহে না ॥

আমরা উপরে যে গীতটি উদ্ধৃত করিলাম তাহা রাম বসুর বিরহ বর্ণনা হইতে ; এক্ষণে আগমনী হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম ;—

ফিরে এলে গিরি, কৈলাসে গিয়া,
তত্ত্ব না পেয়ে যার।
তোমার সেই উমা এই এল, যাতনা ঘুচিল,
সঙ্গে শিব পরিবার ॥
এখন গঞ্জনা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ,
সব দুঃখ দূরে গেল।
আমার মা কৈ মা কৈ, বলে উমা ঐ,
ব্যগ্র হয়ে দাঁড়াইল ॥
হোক হোক হোক, উমা সুখে রোক
সদাই হ'তেছে মনে।
ভিখারীর ভাগ্যে, পড়েছেন দুর্গে,
তাঁর ভাগ্যে হেন হবে কে জানে ॥

দুহিতার সুখ, শুনিলে হে গিরি,
যে সুখ হয় আমার।
আছে কন্যা যার, সেই শুধু জানে,
অন্যে কি জানিবে তার॥
যদি কেহ বলে, ওগো উমার মা,
উমা ভাল আছে তোর।
যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধাইয়া যাই,
আনন্দে হ'য়ে বিভোর॥

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই; যাহা হইল তাহাতেই কবির ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রাম বসু রচনায় যেরূপ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন—ভাব পারিপাট্যে ততদূর কৃতকার্য্য হন নাই; তাঁহার রচনা যেরূপ সুচিক্কণ ও মনোমুগ্ধকর—ভাবের তাদৃশ মনোহারিত্ব নাই; ভাব মাধুর্য্য অপেক্ষা তাঁহার রচনা চাতুর্য্য অতি পরিপাটি: তাঁহার কল্পিত প্রেম, প্রেমের উচ্চ আদর্শ নহে—তাহা ইন্দ্রিয়-পর লোকের কলুষিত প্রেম; তাহাতে গভীরতা নাই—কেবল পঙ্কিলতা আছে, তাহাতে আত্ম বিস্মৃতি—আত্ম বিসর্জ্জন নাই;—সর্ব্ব স্থলেই আত্ম সুখ পরায়ণতা ও ভোগ নিরতি আছে।) ইহার প্রেম আত্মোৎসর্গ করিয়া—আপনাকে দুঃখের বিকট গ্রাসে ফেলিয়া—পরকে সুখী করিতে পারে না; ইহা আপনার দুঃখের অংশ পরকে দিয়া সুখী হইতে চাহে: এ প্রেম প্রেমের পবিত্র আদর্শ নহে—ইহা কলুষিত প্রেম; কিন্তু এরূপ প্রেম বর্ণনার জন্য রামবসু দোষী নহেন। যে দোষের জন্য ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে ভক্তি রসের অবতারণা করিতে গিয়া, অশ্লীলতা-পূর্ণ বিদ্যাসুন্দরের কলুষিত চিত্র আঁকিয়া ফেলিয়া

ছেন—সেই গুরুতর দোষেই রাম বসু প্রেমের পবিত্র চিত্র দিতে গিয়া এরূপ কলঙ্কিত প্রেমের চিত্র আঁকিয়া বসিলেন। (এ দোষ রাম বসুর নহে—এ দোষ তদানীন্তন সমাজের।) তদানীন্তন সমাজ কি প্রকার ছিল এক্ষণে তাহাই দেখিতে হইতেছে। সেই সময়ে ইংরাজগণ দেশে কতকটা শান্তি স্থাপন করিয়াছেন—দেশে আর ততটা অরাজকতা নাই—দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর ভয়ানক অত্যাচার তখন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে; বঙ্গবাসী আর একবার ভোগ সুখে নিরত হইয়াছেন। বাঙ্গালী চিরকাল আত্ম সুখ পরায়ণ ও অনুকরণ প্রিয়; এমন অনুকরণ প্রিয় জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই; তাই মুসলমানগণের কঠোর রাজত্ব কালে তাঁহাদের অনেক বিষয় অনুকরণ করিয়াছিলেন; মুসলমান প্রজার ন্যায় তাঁহারাও "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিতেন; আত্ম সুখ বিধানের জন্যই চির-জাতি-প্রথা-প্রিয় ভারতবাসী কুল শীলের মায়া পরিত্যাগ করিয়া—লাঞ্ছনা—গঞ্জনা তৃণ জ্ঞান করিয়া আপনাপন কন্যা, ভগ্নীকে যবনের উপভোগ্যা করিয়া দিয়াছিলেন; মুসলমানের ন্যায় বাঙ্গালীগণও বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহাদের আপন স্ত্রী দাসী মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। তখন পরকীয়া প্রেমই যথার্থ প্রেমিকের মান্য পাইত, আর স্বকীয়া প্রেম স্ত্রৈণ পদ বাচ্য হইত। আবার ইংরাজ দেশের রাজা; তাঁহারা সে কালে এক্ষণকার ন্যায় স্বদেশ হইতে আপনাপন স্ত্রী-কন্যা আনিতেন না; সুতরাং তাঁহারা কেবল পাশবোপায় দ্বারা তাঁহাদের পাশব লালসা চরিতার্থ করিতেন—আবার এই জন্য সময়ে সময়ে তাঁহারা পৈশাচিক বৃত্তি অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। চির অনুকরণ প্রিয় বঙ্গবাসী এই সকল

হইতে কেন না পরকীয়া প্রেম শিক্ষা করিবেন? তাই সে সময়ে পরকীয়া প্রেমেরই আদর; তখন যিনি যত অধিক সংখ্যক গণিকা রাখিতে পারিতেন, তিনিই তত উচ্চ প্রেমিক বলিয়া অভিহিত হইতেন। সমাজের এইরূপ অবস্থায় রাম বসুর জন্ম; সুতরাং তিনিও সমাজের প্রবণতা অনুসারে গীত গাহিলেন—তাহাতে তাঁহার দোষ কি? কোন লেখকের রুচির জন্য তদানীন্তন সমাজ যতটা দায়ী—লেখক ততটা নহেন; সুতরাং রামবসুর রচনায় যে, প্রেমের গভীরতা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা তাঁহার দোষে নহে—সমাজের দোষে; তথাপি রামবসু একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার রচিত এই একটি গীতে উচ্চ প্রেমেরও আদর্শ আছে। ইঁহার কবিতা যেন স্বভাবের মুক্তহস্ত হইতে আপনা হইতেই বহির্গত হইয়াছে; তাহাতে কোন প্রকার কষ্ট-কল্পনা নাই—সকলগুলিই সরল ও সুন্দর। তাঁহার গীতের স্থানে স্থানে অতি উচ্চ দরের ভাব অভিব্যক্তি আছে; প্রেম বর্ণনা ছাড়িয়া তাঁহার রচিত অন্যান্য গীতি দেখিলে এ কথা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতীয়মান হয়; আমরা তাঁহার আগমনী হইতে যে গীতটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার ভাব অতি মহান্—এমন স্নেহপূর্ণ-গভীর ভাব বিশিষ্ট রচনা দুর্লভ। যাহা হউক, রামবসু একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কবিওয়ালাগণ দেশ হইতে এক্ষণে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছেন; কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় ইহাদের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল; এই সময়ে আমরা অনেক কবিওয়ালার দর্শন লাভ করিয়া থাকি। তাঁহাদের মধ্যে হরুঠাকুর ও রামবসুই প্রধান; তাঁহাদের নিম্নে নিলুরামপ্রসাদ, রামনৃসিংহ, নিতাই বৈষ্ণব, লালুনন্দ

লাল, কৃষ্ণ-মুচি, নীলমণি পাটুনী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, সাতুরায় প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ। এই সময়ে ইঁহাদের এতই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, দুই এক জন ইয়ুরোপীয় পর্যান্ত ইহাদের দলপুষ্ট করিয়াছিলেন; কবিওয়ালা আণ্টনী ফিরিঙ্গীর নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন; আণ্টনী সাহেবের রচনা ও নিতান্ত মন্দ নহে; তিনি গাহিয়াছিলেন;—

যদি নিজ গুণে তার মোরে এ ভবে মাতঙ্গী।
আমি ভজন পূজন জানি না মা! জাতিতে ফিরিঙ্গী॥

কবিওয়ালাগণের মধ্যে আমরা কেবল ইহাদেরই নামোল্লেখ করিলাম; তদ্ব্যতীত আরও অনেক কবি ছিলেন তাঁহাদের নাম আর এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

কবিওয়ালাগণের পরেই আমরা রাজা রামমোহন রায়ের কালে সমুপস্থিত হইতেছি; রামমোহন রায় ধর্ম্ম সংস্কারক ছিলেন; তাঁহার ধর্ম্ম সংস্কার স্বাধীন ভাবের ফল; রামমোহনের পূর্ব্বেই ইংরাজ রাজ দেশ হইতে অশান্তির কারণ সমুদায় বিনাশ করিয়া লোকের স্বাধীন চিন্তার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন; সেই প্রশ্রয় দিবার ফল রাজা রামমোহন। বঙ্গবাসী—চিরকালই অতি বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; একথা অমূলক নহে; তাঁহারা যখনই সুবিধা পাইয়াছেন—যখনই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পাইয়াছেন, তখনই নানা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন;) ধর্ম্ম হিন্দুগণের অতি আদরের ধন; সুতরাং স্বাধীন চিন্তায় যে, সেই আদরের ধনের সংস্করণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? স্বাধীন পাঠানরাজগণের রাজত্ব সময়ে বঙ্গে একটু স্বাধীন ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল—সেই স্বাধীন ভাবের ফল চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম প্রচার—

রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় শাস্ত্র প্রচার—ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি শাস্ত্রের বিস্তার। কিন্তু স্বাধীন পাঠানগণের সময়ে স্বাধীন চিন্তার প্রণোদনে যেমন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার হইল, অমনি ঠিক সেই সময়ে—সেই রূপেই "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব" জন্ম গ্রহণ করিল—সুতরাং সেই দিন হইতেই সমান স্বাধীন ভাবেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের মূলে কুঠারাঘাত হইবার উপায় হইল। যেরূপ স্বাধীন ভাবে চৈতন্য দেব নব ধর্ম্ম বিধান করিলেন—সেইরূপ স্বাধীন ভাবেই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য সেই সময়ে তাহার প্রশমনার্থ "অষ্টা-বিংশতি তত্ত্ব" প্রচার করিলেন; সুতরাং পরস্পর সংঘাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সমাজে অধিকদিন প্রচরদ্রূপ রহিতে পারিল না। যদি একই সময়ে রঘুনন্দনের তত্ত্ব সকল প্রণীত না হইত, তাহা হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবস্থা কি প্রকার হইত কে বলিতে পারে। যাহা হউক, যেরূপ স্বাধীন চিন্তাক্ষম সমাজের ফল গৌরাঙ্গ—সেইরূপ স্বাধীন সমাজের ফল রামমোহন; রামমোহনের সময়ে সমাজে পুনরায় স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রসারিত হইয়াছে। এই মহাত্মাই সেই সময়ে সনাতন ধর্ম্মের পৌত্তলিকতা বিনষ্ট করিয়া যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা একেশ্বর বাদ সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইলেন; এই জন্য তিনি কলিকাতা মহানগরীতে একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু-সমাজ হইতে তিনি প্রথমে অতিশয় বাধা প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, এই বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের সংঘর্ষে এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। শুধু তাহাই নহে; এই সময়ে সামাজিক অত্যাচার সকল নিবারণ করি-বার জন্য রামমোহন সৎযুক্তি মূলক বহুল গ্রন্থ রচনা করেন,

আবার হিন্দু-সমাজ হইতে সেই সকল মতের খণ্ডন স্বরূপ নানাবিধ পুস্তক প্রণীত হয়; সুতরাং এই খণ্ডন প্রতি খণ্ডনে বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়; এই ঘাত প্রতিঘাতে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ আলোড়িত ও বলপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এতদিন পরে আমরা তাহার ফলভোগ করিতেছি। এই সময়ে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়, প্রায় তৎসকল গুলিই গদ্য, সুতরাং গদ্য রচনা এই সময় হইতেই সুপরিষ্কৃত ও সুমার্জ্জিত হইতে আরম্ভ হয়।

অনেকে বলেন রামমোহনই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গদ্য লেখক; কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে সময়ে বাঙ্গালা পদ্যের উৎপত্তি, ঠিক সেই সময়েই বাঙ্গালা গদ্যের জন্মলাভ; বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেরূপ প্রথম বাঙ্গালা কবিতা লেখক—তাঁহারা সেইরূপই ইহার আদি গদ্য লেখক; তৎপরবর্ত্তী শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী প্রভৃতি চৈতন্যসহচরগণ পদ্যেরন্যায় গদ্যেও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন; তাঁহাদের পর কথক সম্প্রদায় ইহার অনেক অঙ্গ-সৌষ্ঠব সাধন করেন; কথক সম্প্রদায়ের অনেক পূর্ব্বেই গদ্যে ত্রিপুরার রাজমালা রচিত হইতে আরম্ভ হয়; আবার প্রতাপাদিত্য চরিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র, রাজাবলী, প্রবোধ চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রামমোহনের পূর্ব্বেই বিরচিত হয়; হরনাথ রায় তাঁহার পূর্ব্বেই সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষার বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ করেন; কিন্তু এতগুলি গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্বে রচিত হই-লেও আমরা তাঁহাকেই আদি গদ্য লেখক বলিতে অসন্তুষ্ট নহি; কেন না তাঁহার পূর্ব্ব সাময়িক গদ্য গ্রন্থ সকল এতাদৃশ জঘন্য ভাষায় লিখিত যে, রামমোহনকেই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা

বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।) তিনি সরল ভাষায় লিখিত উপর্য্যুপরি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই সময়ে এদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন; তাঁহার সময়ে সহমরণ প্রথা লইয়া হিন্দু-সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়; বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত প্রয়াসী—হিন্দু-সমাজ তাঁহার বিরোধী; এমন সময়ে রাজা রামমোহন তাঁহার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার অনেক পূর্ব্বে লর্ড ওয়েলেসলী একবার সতীদাহ উঠাইবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইয়াছিলেন—কিন্তু তিনি হিন্দু-সমাজের এবম্বিধ অসন্তোষ দর্শনে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; বিশেষতঃ রাজ্য বৃদ্ধি করিতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইয়াছিল; এক্ষণে বেণ্টিঙ্ক, রামমোহন ও তাঁহার দলের সহায়তা প্রাপ্ত হইলেন। রামমোহন এই সময়ে সুযুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সতীদাহ নিবারণ করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই সংঘর্ষে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ বল প্রাপ্ত হইল। যদিও তদানীন্তন বাঙ্গালা ভাষা এক্ষণকার ন্যায় সুপরিস্কৃত ও সুমার্জ্জিত হয় নাই, তত্রাপি তাহা যে অনেক পরিমাণে চিক্কণ হইয়া আসিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রামমোহন রায় যে কেবল গদ্য রচনাই করিয়াছিলেন তাহা নহে; তাঁহার প্রণীত অনেকগুলি গীত আছে; সে গুলি অতীব প্রীতিপ্রদ ও মনোহর। রামমোহন বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপয়িতা; সুতরাং তাঁহার গীতগুলিও সেই ধর্ম্মের পোষক স্বরূপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই হিন্দু-শাস্ত্রানুযায়ী মায়াময় জগতের অনিত্যতা প্রতিপাদক বলিয়া হিন্দুগণেরও চিত্তাকর্ষণ

করিয়াছিল এবং এক্ষণেও তাহা হিন্দুগণের আদরের ধন। যাহা হউক, আমরা রাজা রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান নির্ম্মাতা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি।

রাজা রামমোহনের পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাদুর্ভূত হন; কবিতা রচনায় ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; কিন্তু তিনি তত্দূর পণ্ডিত ছিলেন না। তখনকার লোকের রুচি তখনও কিয়দংশে অশ্লীলতার দিকে ছিল; সুতরাং তাঁহার অনেক কবিতা অশ্লীলতা দুষ্ট। বিশেষতঃ তাঁহার সম্পাদিত প্রভাকরের সহিত যখন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত রসরাজের রসালাপ হইত, তখন পরস্পরের গালি বর্ষণ এত কদর্য্য যে, তাহা গোপনে পাঠ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। যাহা হউক, ঈশ্বরচন্দ্রের যথার্থ কবিত্ব শক্তি ছিল বলিয়া তাঁহার কতিপয় রচনা এতই মধুর যে, তাহা পাঠ করিলে মন-প্রাণ সুশীতল হয়; সে গুলি যেমন মসৃণ, তেমনই সুন্দর ভাবে পরিপূর্ণ। তাঁহার কতকগুলি কবিতা যেন স্বভাবের হস্ত হইতে বহির্গত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার কবিত্বে যে প্রকার ক্ষমতা ছিল, পাণ্ডিত্যে সে প্রকার থাকিলে তাঁহার রচনা অতীব প্রীতিকর হইত। যাহা হউক, তিনি হাস্যরসের প্রবর্ত্তনায় অদ্বিতীয় ছিলেন; হাস্যরসে তাঁহার মত কৃতীলেখক আর দেখিতে পাই না। যাহা হউক, ঈশ্বরচন্দ্র অন্য বিষয়ে বিশেষ মান্য পাইবার উপযুক্ত; এক্ষণকার প্রধান প্রধান বঙ্গীয় লেখকগণ প্রায় সকলেই তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া রচনা অভ্যাস করেন; ইঁহারা তাঁহার উৎসাহে দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইতেন সন্দেহ নাই। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল্ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় আধুনিক

লেখকগণ প্রায় সকলেই তাঁহার সম্পাদিত প্রভাকরে প্রথম রচনা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতী লেখকগণ পাঠদ্দশা হইতেই প্রভাকরে কবিতাদি প্রকাশ করিতেন; ঈশ্বরচন্দ্র ইঁহাদিগকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিতেন; বলিতে পারি না বাল্যকাল হইতেই ইঁহারা এইরূপে উৎসাহিত না হইলে, ইঁহাদের মাতৃভাষার প্রতি এতাধিক শ্রদ্ধা হইত কি না? বিষবৃক্ষ, আনন্দ মঠ, নবীন তপস্বিনী সেই উৎসাহ বৃক্ষের ফল কি না কে বলিতে পারে? যাহা হউক, ঈশ্বরচন্দ্র স্বতঃ হউক, পরতঃ হউক, বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রভাকরের উদিতোন্মুখী প্রভা সন্দর্শনেই পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হয়; পদ্মিনী উপাখ্যানে রঙ্গলাল বাবু যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন—ইহার স্থান বিশেষের রচনা অতীব মধুর ও সুন্দর।

গদ্য রচনার বিষয় দেখিতে গেলে রামমোহনের পরে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পবিত্র নাম আমাদের স্মৃতি পটে অগ্রে সমুদিত হয়; ইঁহার নিকট আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা যে পরিমাণে ঋণী, এত অন্য কাহারও নিকট নহে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত বঙ্গভাষার একজন কৃতী লেখক সন্দেহ নাই; তাঁহার তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত "প্রাচীন হিন্দুগণের বাণিজ্য", "পাণ্ডবগণের অস্ত্র শিক্ষা" বা "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" অতি উৎকৃষ্ট; কিন্তু ইহার উন্নতির মূলেও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্ত্তমান; বিদ্যাসাগর মহাশয়ই অক্ষয়কুমারের প্রথম প্রথম রচনা সংশোধন করিয়া দিতেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ,

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি কৃতী লেখকগণ এক্ষণে বঙ্গ সাহিত্যাকাশ উজ্জ্বল করিতেছেন, কিন্তু বর্ত্তমান নানা লেখক সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা কেবল বঙ্গীয় সাহিত্যের উৎপত্তি ও তাহার ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি; সুতরাং এই স্থানে সাহিত্যোন্নতির প্রধান পরিপোষক সম্বাদ বা সাময়িক পত্রিকার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি দেখিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বঙ্গভাষায় সর্ব্ব প্রথমে "বেঙ্গল গেজেট" নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়; গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ইহার সম্পাদক ছিলেন; এই পত্রখানি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়; ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষায় অন্য কোন পত্রিকা ছিল না; গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য এই কারণে বঙ্গভাষার প্রথম পত্রিকা প্রচারের মান্য পাইতে পারেন; ইহার পরেই সেই বৎসরেই সুবিখ্যাত মিসনরী মার্সম্যান সাহেব "সমাচার দর্পণ" প্রচার করেন; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে "দিগ্দর্শন" নামে প্রথম সাময়িক পত্র কেরী সাহেব কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়; ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে মিলিত হইয়া "কৌমুদী" নামক সংবাদ পত্র, ও শ্রীরামপুরের মিসনরীগণ "গস্পেল্ ম্যাগাজিন" প্রকাশ করেন; ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রামমোহন "ব্রাহ্মণ সেবধী" বা "ব্রাহ্মণিক ম্যাগাজিন" নামক সাময়িক পত্র প্রচার করেন; এই সময়ে সহমরণ প্রথার আন্দোলনে রামমোহন হিন্দু সমাজের বিপক্ষতাচরণ করিলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া নিজে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে "সমাচার চন্দ্রিকা" নামক সংবাদ পত্র প্রথম

প্রচার করেন। এই সময়ে বাঙ্গালাভাষা বিশেষ রূপে সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই সময়ে তিনটি ধর্ম্মের আন্দোলনে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ পুষ্টি-লাভ করে; একদিকে ভবানীচরণ ও হিন্দুধর্ম্ম, অন্যদিকে রামমোহন ও বেদান্ত, ও অপরদিকে কেরী, মার্ষম্যান ও বাইবেল; এই তিন বিভিন্ন মতের সংঘর্ষণে ও সহমরণ প্রথার আন্দোলনে বঙ্গভাষা সজীব ও সবল হইয়া উঠিল; ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে নীলরত্ন হালদার কর্ত্তৃক "বঙ্গদূত" প্রকাশিত হয়; অনন্তর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "প্রভাকর" প্রচার করেন; ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক "জ্ঞানোদয়" নামক সাময়িক পত্রিকা সম্পাদিত হয়; এই সময়ে বঙ্গদেশের আদালত সমূহ হইতে পারসীভাষা অন্তর্হিত হইয়া বাঙ্গালাভাষা তাহার স্থান অধিকার করে; ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাচরণ সেন "বিজ্ঞান সেবধী" নামে আর একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন; ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈতচরণ আঢ্যের যত্নে "সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়" প্রথম প্রচারিত হয়; ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্য) "ভাস্কর" ও "রসরাজ" বাহির করেন; ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের প্রযত্নে "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" জন্ম গ্রহণ করে; ইহাই মফঃস্বলে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা; ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত "বিদ্যাদর্শন" নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রচার করেন; এই সময়ে উপর্য্যুপরি "পথ্য প্রদান" "পাষণ্ড পীড়ন" "আক্কেল গুড়ুম" প্রভৃতি নানাবিধ পত্রিকার ছড়াছড়ি হয়; অনন্তর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন; ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজা কালীনাথ চৌধুরীর যত্নে "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ"

নামে সংবাদ পত্র জন্ম গ্রহণ করে; ইহাই মফঃস্বলের দ্বিতীয় সংবাদ পত্র; তদনন্তর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি মহাত্মাগণ "সর্ব্বশুভ-করী পত্রিকা" নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচার করেন; ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক সাময়িক পত্রিকা প্রচার করিতে ব্রতী হন; "তত্ত্ববো-ধিনী পত্রিকা" ও "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বাঙ্গালাভাষার যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে; এই দুইখানি পত্রিকাই বিশুদ্ধ প্রণালীতে লিখিত হইত এবং দুইখানিই নিত্য নূতন তত্ত্ব প্রচার ও লোকের ভ্রম দূর করিবার নিমিত্ত ব্রতী ছিল; ইহা-দের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় যাবতীয় পত্রিকাই কদর্য্য ভাষায় লিখিত হইত, এমন কি তাহাদের মধ্যে কেহই পত্রিকা নামেরই উপযুক্ত ছিল না; এই জন্য "তত্ত্ববোধিনী" ও "বিবিধার্থ সংগ্রহকেই" বাঙ্গালাভাষার প্রথম সাময়িক পত্রিকা ধরিতে হয়। শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সংস্কৃত বহুল সাধুভাষার প্রতি বিরক্ত হইয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাবু রাধানাথ সিকদার ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র "মাসিক পত্রিকা" নামে একখানি অপভাষায় লিখিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন; ইহাতেই প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম প্রকাশিত হয়। এই রূপে ক্রমে ক্রমে এতগুলি পত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিল সত্য বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক অবস্থা সমালোচন, বা দেশের অভাব বিজ্ঞাপন ও সমাজের ভ্রম প্রমাদ পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত একখানি পত্রিকাও জন্ম গ্রহণ করে নাই; তদনন্তর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন করিবার

জন্য "সোমপ্রকাশ" জন্ম গ্রহণ করে; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ইহার সম্পাদক; কিন্তু এই পত্রের প্রথম উদ্ভাবক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; তিনি কোন নিঃস্ব বালকের জীবনোপায় করিয়া দিবার জন্যই "সোমপ্রকাশের" কল্পনা করেন; পরে কোন কারণ বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই; তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম প্রথম "সোমপ্রকাশে" প্রবন্ধাদি লিখিতেন। "সোমপ্রকাশ" প্রকাশের পর হইতে বাঙ্গালাভাষায় নানাবিধ উৎকৃষ্টতর সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এ স্থলে তদুল্লেখের আর প্রয়োজন নাই।)

যাহা হউক, আমরা বাঙ্গালাভাষার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া এতদূরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; ভাষার ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা দেখাইলাম বঙ্গভাষা পূত সলিলা সুরধুনীর ন্যায় প্রথমে অত্যুচ্চ হিমালয় সদৃশ সংস্কৃত ভাষা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, হরিদ্বার তীর্থ সদৃশ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কল্পনায় আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে; গঙ্গা তথা হইতে নির্গত হইয়া যেমন প্রয়াগ তীর্থে শ্রীকৃষ্ণের রঙ্গ কানন মথুরা ও বৃন্দাবনের পদদেশ বিধৌতকারিণী যমুনার সহিত মিলিতা হইয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষাও তদ্রূপ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নিকট হইতে আসিয়া গোবিন্দদাস প্রভৃতি অনেক কবি কর্তৃক বৰ্দ্ধিতায়তন হইয়াছে; প্রয়াগ তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া সুরধুনী শিব-দুর্গার প্রিয় স্থল কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; বঙ্গভাষাও সেইরূপ কবিকঙ্কণের চণ্ডীর ছটা মস্তকে ধারণ করিয়া আহ্লাদে উৎফুল্লা হইলেন; অনন্তর জহ্নুতনয়া যেমন

করিবার কারণ কি আছে? তবেই এক্ষণে দেখা যাইতেছে বাঙ্গালার প্রতি বাঙ্গালীর আদর বাড়িয়াছে;—বাঙ্গালী এক্ষণে বুঝিয়াছেন জাতীয় পতাকার নিম্নেই জাতীয় সাহিত্য; তাই তিনি বঙ্গভাষার আদর করিতেছেন। জনৈক ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন "জাতীয় পতাকার নিম্নেই জাতীয় সাহিত্য পূজা পাইবার সামগ্রী; এই জন্য প্রত্যেক যুবকের অন্ততঃ জীবনের তৃতীয়াংশ সময় ইহার উন্নতি কল্পে ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য।" আমাদের জাতীয় পতাকা নাই—সুতরাং জাতীয় সাহিত্যই আমাদের প্রধান পূজার দ্রব্য; বাঙ্গালী এই কথাটি বুঝিতেছেন ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। বিশেষতঃ তাঁহারা এই ত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যেই ভাষার যাদৃশ শ্রী-সম্পাদন করিয়াছেন, অন্য কোন জাতি—এত অল্প সময়ের মধ্যে এতাদৃশ উন্নতি সংসাধন করিতে সমর্থ হন নাই। বাঙ্গালী চিরকাল জরাগ্রস্ত—তাঁহার গৌরব করিবার কিছুই নাই, কেবল তাঁহার ভাষার উন্নতিই তাঁহার গৌরব করিবার স্থল। বাঙ্গালী এই ভাষার দোহাই দিয়াই জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারেন।

✓জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় উন্নতির মূল; জাতীয় সাহিত্য যেমন জাতীয় জীবনের উন্মেষক, এমন আর কিছুই নহে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি হইতে আরম্ভ হইলেই স্বাধীন চিন্তাও তৎসহ সমাজে প্রবেশ পথ পায় এবং সেই স্বাধীন চিন্তা স্রোত হইতেই ক্রমশঃ সমাজে জাতীয় চরিত্র স্বাধীন ভাবে গঠিত হইতে থাকে। সুতরাং ভাষা সমাজের সাধারণ উপকারী নহে, বঙ্গবাসী সেই ভাষায় আদর করিতে শিখি- [illegible]—এই ত্রিংশৎ বৎসর মধ্যেই ভাষায় এতাদৃশ উন্নতি

সাধন করিতে পারিয়াছেন—ইহা তাঁহাব পক্ষে সামান্য গৌরবেব কথা নহে।) কিন্তু এক্ষণেও অনেক বাকী আছে—তাহার এই উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে, অতএব বঙ্গবাসী। এই সময় হইতে ইহাব উন্নতি কল্পে অধিকতর মনোযোগী হও—দেখিবে, শত বৎসর পরে তোমবা পৃথিবীর মধ্যে এক নীয় জাতি মধ্যে পরিগণিত হইবে—তথন আব এক্ষণকার নগণ্য মধ্যে পড়িয়া থাকিবে না। তবে একবাব সমবেত হইয়া—নবীন উৎসাহে মাতিয়া—ইহার শ্রীবৃদ্ধি সংসাধন কবিতে ব্রতী হও, যৎকালে চতুর্দ্দিকেই আশালোক জ্বলিতেছে, তথন আব আশঙ্কা কবিবার কারণ কি? যখন জাতীয় সাহিত্যই জাতীর উন্নতির মূল, তখন সেই সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে সমধিক যত্নবান হও—তাহার সুফল শীঘ্র ফলবতী হইবে।

ইতি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।